প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৬০

স্বত্ব : শঙ্খ ঘোষ

প্রচ্ছদশিল্পী : অজয় গুপ্ত

প্রকাশক : অরিজিৎ কুমার
প্যাপিরাস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৪

মুদ্রক : নিশিকান্ত হাটই
তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৬ বিধান সরণী
কলকাতা ৭০০ ০০৬

জেলদগর : দীনেশ বিশ্বাস
১৯/১ই পাটোয়ারবাগান লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রুফ-সংশোধক : সুবিমল লাহিড়ী

প্রবোধচন্দ্র সেন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ভূমিকা

কবিতা নাটক বা উপন্যাস যখন আমরা পড়ি, আমরা চাই আমাদের অভিজ্ঞতার আরেকটু স্পষ্টতা, আমাদের অভিজ্ঞতার আরেকটু প্রসার। স্পষ্টতার বা প্রসারণের সেই আনন্দই আমাদের সাহিত্য পড়ার আনন্দ। সাহিত্যের সমালোচনাতেও পাঠক নিশ্চয় আশা করেন যে সমালোচক তাঁর কাছে পৌঁছে দেবেন সেই আনন্দের কোনো স্বাদ, অথবা সেই অভিজ্ঞতার কোনো বিশ্লেষণ।

কিন্তু এ বইয়ের লেখাগুলিতে তেমন কোনো বিশ্লেষণ নেই, নেই কোনো আস্বাদনও। এই লেখাগুলির লক্ষ্যে ছিল কেবল কয়েকটি তথ্যের বিচার, প্রধানত রবীন্দ্রনাথের জীবন আর সাহিত্য বিষয়ের কয়েকটি তথ্য। সেই হিসেবে, সাহিত্যরসিকের মনে হতে পারে, এ বই নিতান্ত নীরস এবং নিষ্প্রয়োজন, সাহিত্যপাঠের দিক থেকে নিষ্ফল।

তবে, সত্য তো একেবারে তথ্যনিরপেক্ষ নয়! অনেকসময়েই তথ্য আমাদের পায়ের তলার মাটি! সে-মাটি সরে গেলে দাঁড়াবার আর জায়গা থাকে না কোনো। সেই কারণেই, সাহিত্যবিচারের সময়ে তার নেপথ্যঘরে প্রায়ই আমাদের সাহায্য নিতে হয় কোনো কোষগ্রন্থের, কোনো-বা আকরগ্রন্থের। যাঁরা কেবলই তথ্য নিয়ে কাজ করেন তাঁদের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করতে হয় আমাদের। সেইসব কোষ বা আকরের কাছে কত যে আমাদের দাবি, আমাদের অসহায় নির্ভরশীলতা যে কতটা, সেইটে জানাবার জন্যই এই লেখাগুলি।

কখনো কখনো শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতজনের কোনো কোনো ভুলের কথাই উঠে এসেছে এখানে। সেটা কেবল এইজন্য যে, তথ্যজগতের অস্পষ্টতা আর অপূর্ণতা দূর হতে পারে আমাদের অনেকের সমবেত চেষ্টায়। যাঁরা অনেক জানিয়েছেন, তাঁরা যে দু-চারটে ভুলও করে ফেলতে পারেন হঠাৎ, সেটা বোঝা যায়। সেই ভয়ে কি কাজ বন্ধ করে দেবেন তাঁরা? রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন তাঁর ছোটো একটি কবিতায়: 'দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি / সত্য বলে, আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি?' এ কথাটা আমাদের মনে রাখতেই হয় যে সত্যের খোঁজ নিতে গেলে স্খলনের সম্ভাবনাও থেকেই যায় কিছু। কাজ যাঁরা করছেন, এরকম স্খলনে তাঁদের সামগ্রিক গৌরবের কোনো লাঘব হয় না। তবে, ইতিহাসের যাথার্থ্যের জন্য, সেইসব বিভ্রম থেকে যে আমাদের যথাসাধ্য সরে আসাও দরকার, তাও ঠিক।

বলা নিশ্চয় বাহুল্য যে আমার এই লেখাগুলিতেও ভুলের সম্ভাবনা রইল অনেক। সতর্ক হতে চেয়েছি, কিন্তু পেরেছি যে সব সময়ে, এমন নয়। অন্য পাঠকেরা কোনোদিন হয়তো জানিয়ে দেবেন সেটা। আর এইভাবে, আমাদের সকলের মিলিত চর্চায়, ঠিক-ঠিক তথ্যের ভূমিতে আমরা প্রতিষ্ঠিত হতে পারব একদিন।

শঙ্খ ঘোষ

রোমাঞ্চকর এক সংকলন

অল্প কয়েকদিন আগে আমাদের হাতে এসে পৌঁছল সমর সেনের একটি বই : 'বাবু বৃত্তান্ত'। সেই বৃত্তান্তে হঠাৎ দেখতে পাচ্ছি এ-রকম এক খবর যে 'তিরিশ দশকের শেষাশেষি রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার একটি সংকলন বের করেন, জোর গুজব সজনীকান্ত দাসের সহযোগিতায় ও পরামর্শে।' লুপ্ত সেই সংকলনটির ঠিক চল্লিশ বছর পরে (১৯৩৮) সমর সেন আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে বিষ্ণু দে আর তাঁর নিজের কবিতা জায়গা পায়নি সে-বইটিতে, আর বিশ্ব-ভারতীকে তিনি আহ্বান জানাচ্ছেন সংকলনটির নানা খবর খুলে বলবার জন্য। সেটা ভালো। তবু এই লাইন-ক'টি পড়ে যেন মনে হলো গুজবের প্রতাপ বড়ো বেশি। আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে অনেক রকম কাজ করেছেন সজনীকান্ত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় যে কাব্যসংগ্রহ 'বের' হয়েছিল সত্যি সত্যি এবং কোনো-কোনো কবি বর্জিতও যে হয়েছিলেন তাতে, এর কতটুকু দায়িত্ব সজনীকান্তের? কতটুকু এখানে কাজে লেগেছিল তাঁর সহযোগিতা আর পরামর্শ? সেটা জানতে হলে রোমাঞ্চকর কয়েকটি দিনের কথা শুনতে হবে আমাদের, প্রায় চল্লিশ বছরের পুরোনো।

২

'বাংলা কাব্যপরিচয়' নামে একটি সংকলন ছাপা হয়েছিল ১৯৩৮ সালে। সম্পাদক, রবীন্দ্রনাথ। সাতাত্তর বছর বয়সে বাংলা

কবিতার কোন্ পরিচয় আমাদের সামনে খুলে দেবেন রবীন্দ্রনাথ, তা জানবার আগ্রহে পাঠকদের নিশ্চয় চঞ্চল হয়ে উঠবার কথা। কেননা, যতই নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাসের চোখে কবিতা নির্বাচনের কাজ করুন কোনো সম্পাদক, ব্যক্তিগত রুচিবিবেক সেখানে তার ছায়া না ফেলে পারে না। গোল্ডেন ট্রেজারিতেও কি নেই পলগ্রেভের নিজস্ব কোনো দৃষ্টিপাত? ব্লেক-ডানকে কি এড়িয়ে যাননি তিনি? ইয়েটসের তুলনায় কুইলার-কোচ অনেক নিরপেক্ষ হয়তো, কিন্তু তাঁরও কি ছিল না একেবারে নিজস্ব কোনো রুচি? ১৯৩৯-এর সংস্করণে তাঁকেও কি বাঁকা কটাক্ষে সরিয়ে দিতে হয়নি নূতন যুগের কবিদের? তাই রবীন্দ্রনাথের ওই সংকলন থেকে আশা করা অন্যায় হতো না যে এখানে আমরা পেয়ে যাব তাঁর চোখে দেখা বাংলা কবিতার বিশেষ এক পরিচয়, কোনো-না-কোনো নূতন বোধে নিশ্চয় দীপ্ত হয়ে উঠব আমরা। আবার পাঠকদের কথা যদি ছেড়ে দিই, জীবিত লেখকদলের কথা যদি ভাবি, তাহলে বুঝতে পারি উত্তেজনা তখন কোন্ অসীম ছুঁয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সামান্যতম প্রশস্তি বা স্বীকৃতি শুনবার জন্য কবিদের মধ্যে তখন প্রতিযোগিতার যে কোনো বিরাম নেই তা আমরা জানি। এই সংকলন কি তেমন প্রকাশ্য এক স্বীকৃতিই নয়? তাই, কার কবিতা কী পরিমাণে থাকবে এখানে, তা নিয়ে তরুণ আধুনিকদের ভাবনার শেষ ছিল না, উৎকণ্ঠায় যেন কাঁপছিলেন তাঁরা।

কিন্তু বড়ো বিস্ময় আর দুঃখের মধ্যে শেষ হলো সে-উৎকণ্ঠা, বইটি যখন হাতে এসে পৌঁছল সবার। প্রবহমান বাংলা কবিতার ঠিক কোন্ চরিত্র প্রকাশ করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এ বইটিতে? বইটির শুরু কেন আলাওলের কবিতায়, আর তার পরে কীভাবে

ক্রমান্বয়ে আসেন কৃত্তিবাস কাশীরাম বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস, এই পরম্পরায় ? বইটির শেষ যে মহীউদ্দীনের কবিতায়, তিনি কে ? মুসলমান নামে শুরু করা আর শেষ করার মধ্যে যে ক্ষীণ একটা তাৎপর্য ধরতে চেয়েছিল 'স্টেটসম্যান', সেইটেই কি কাজ করেছে এই নির্বাচনের পিছনে ? জীবনানন্দের পরবর্তী কবি হিসেবে রামেন্দু দত্ত, দিলীপকুমার সান্যাল, সুকোমল বসু, সুধাংশুশেখর সেনগুপ্ত, আশু চট্টোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, বাসব ঠাকুরদের নামই বা পাওয়া গেল কোথায় ? এমন নয় যে নামগুলি অপরিচিত লাগছে কেবল আজকের চোখে, সমকালেও এমন প্রশ্ন তুলেছিলেন 'কবিতা' পত্রিকায় বুদ্ধদেব, লম্বা এক নামের ফিরিস্তি দিয়ে বলেছিলেন যে এই 'ভদ্রলোকগণ যে কবিতা লেখেন বাংলা কাব্যপরিচয়েই তা প্রথম জানলুম।' সংকলনে এঁরা কেন আছেন তাও যেমন বুঝতে পারেননি বুদ্ধদেব, তেমনি তিনি বুঝতে পারেননি কেন নেই জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র বা প্রণব রায় বা কামাক্ষীপ্রসাদের মতো অনেকের লেখা, আর সর্বোপরি বিষ্ণু দে আর সমর সেন। জীবনানন্দের 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি কেন হলো সংক্ষেপিত, 'নবীন লেখনী' নামে সুধীন্দ্রনাথের একটি দুর্বল কবিতাই কেন নির্বাচন করা হলো, গদ্যকবিতা যদি বর্জিতই করা হবে তো নিশিকান্তের কবিতাটি এল কেমন করে, প্রেমের কবিতা প্রত্যাখ্যান করবার এত কেন উৎসাহ রবীন্দ্রনাথের, এর কিছুই বুঝতে পারেন না বুদ্ধদেব। কেবল বুদ্ধদেবই নন অবশ্য। প্রশ্ন তুলেছিলেন দিলীপকুমার রায়, কেন এখানে নেই অতুল-প্রসাদের কোনো লেখা, আর কেন নেওয়া হলো তাঁর নিজের দুটি বর্জনযোগ্য কবিতা। প্রশ্ন তুলেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ, সংকলয়িতা জানেন কিনা 'তন্বী' ছাড়া তাঁর অন্য দুখানি বইয়ের নাম। বস্তুত, 'কবিতা'

পত্রিকার সমালোচনাটিতে ধরা পড়েছিল সেদিনকার কবিসমাজের মিলিত এক ধিক্কার, যে-ধিক্কার থেকে ঝাঁপ দিয়ে উঠেছিল এমনও এক সংশয়, সমর সেনের সাম্প্রতিক অভিযোগের মতোই : 'বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না যে রবীন্দ্রনাথই এ বইয়ের সম্পাদক। হয়তো শারীরিক অসুস্থতার জন্যে তাঁর কেরানিদের উপর তিনি বড়ো বেশি নির্ভর করেছিলেন।'

কারা ছিলেন এই কেরানি ?

আজও যেমন, আগেও তেমনি, কাব্যসংকলনের একটা বিপজ্জনক কলহবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় কবিতাসংখ্যার পরিমাণভেদ। রবীন্দ্রনাথের কবিতাই যে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি—সতেরো—সেটা স্বাভাবিক আর প্রত্যাশিত, তবু বিনয়বশে তার জন্যে কবি ভূমিকায় অনেক কৈফিয়ৎ দেন। কিন্তু যে কথাটা খুব স্পষ্ট নয় তা এই যে অন্যদের রচনায় পরিমাণভেদটা ঘটছে কোন্ বিচার থেকে। এখানে সতেরোর পরের সংখ্যা ছয় ; ছটি আছে ছড়া, ছটি কবিতা মধুসূদনের। চারটি কবিতার অধিকার পেয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ, উমাদেবী আর নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। তিনটি আছে মুকুন্দরামের, রামপ্রসাদের, দাশরথি রায়ের, যতীন্দ্রমোহন-নজরুল-সুকুমার-মোহিতলাল আর প্রেমেন্দ্র মিত্রের। বাকি সবাই আছেন এক বা দুইয়ের দলে। দ্বিজেন্দ্রলালেরও যদি দুটি, নন্দগোপালের কেন চারটি তবে ? এই প্রশ্ন তুলেছিলেন বুদ্ধদেব, জানতে চেয়েছিলেন 'দ্বিজেন্দ্রলালের চাইতে নন্দগোপাল সেনগুপ্ত বড়ো কবি ?'

সকলেই জানতেন যে নন্দগোপাল ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সহকারী, তাঁর নামটা সন্দেহবৃত্তে উঠে আসাটা তাই আশ্চর্যের নয়। আর ভূমিকার শেষে সহায়ক হিসেবে কাননবিহারী মুখো-

পাধ্যায়ের নাম ছিল বলে এ নামটিও সন্দেহভাজন হয়ে রইল। কিন্তু কেবল এ দুটিই নয়, আরো কোনো-কোনো নাম পাওয়া গেল জল্পনাসূত্রে। কলকাতা থেকে যতীন্দ্রমোহন বাগচীরা মনে করলেন যে কবিতাগুলি নির্বাচন করেছেন আসলে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ আর সুধীরচন্দ্র কর। সুধীরচন্দ্রেরও দুটি কবিতা ছিল বলে কি ও-নামটার কথা উঠল হঠাৎ? প্রশান্তচন্দ্রের কোনো কবিতা অবশ্য ছাপা হয়নি এ বইতে।

খ্যাত লোকেরা যখন কোনো সংকলন করেন, এ ধরনের সন্দেহের দায় থেকে বাঁচা তাঁদের শক্তই হয়ে ওঠে। বুদ্ধদেব বসু, আবু সয়ীদ আইয়ুব অথবা বিষ্ণু দের মতো মানুষেরা যখন এই একই কাজ করেছেন উত্তরকালে, একই ধরনের প্রচার আমরা শুনতে পেয়েছি জনরসনায়। আর এটা যে কেবল এদেশেই ঘটে এমনও নয়। 'বাংলা কাব্যপরিচয়'-এর অল্প আগেই ছাপা হয়েছিল ইয়েটসের 'অক্সফোর্ড বুক অব মডার্ন ভার্স।' আর ওদেশে তখন একইরকম আলোড়নে ভুগছিলেন ইয়েটস। ও-বই নিয়ে এতটাই আক্রমণ তখন উথলে উঠছিল চারদিকে যে শরীর খারাপ লাগছিল তাঁর। সেই আক্রমণের অন্যতম এক দিক ছিল ক্লিফোর্ড ব্যাক্সের এই মন্তব্য যে কবিতাগুলির নির্বাচন ইয়েটসের স্বকৃত নয়। কেন তিনি সংকলন-ভুক্ত করছেন ডরোথি ওয়েলেসলিকে, যে-ডরোথিকে কবি বলেই মানেন না অনেকে, যিনি কেবল ইয়েটসের বান্ধবী আর পরামর্শদাত্রী? কোথা থেকে এলেন গোগার্তি নামের এই কবি?[১] কীভাবে এখানে বর্জিত হন আওয়েনের মতো কবি, যাঁর বিষয়ে ইয়েটস মন্তব্য করতে

১. এ দেশে বসে বুদ্ধদেব অবশ্য খুশি ছিলেন এই নামটির আবিষ্কারে।

সাহস করেন ‘কবি খারাপ, কিন্তু চিঠি লেখেন ভালো।’ যুদ্ধের কবিতা কবিতাই নয়, এই হিসেবটাই বা তিনি পেলেন কোথায়? যে-সমালোচনাগুলি ছাপা হচ্ছিল তখন, ইয়েটস তাতে লক্ষ করছিলেন ‘the critics get more and more angry’ আর ডরোথি সেগুলিকে বলছিলেন ‘half-wit reviews’; তাহলেও বোঝা যায় যে একটু কোণঠাসা জায়গায় নিজেকে নিয়ে গেছেন সম্পাদক, যখন তিনি বলেন আওয়েন বিষয়ে ‘He is all blood, dirt’ অথবা যখন তাঁর মনে হয় (যেন অনেকটা রবীন্দ্রনাথেরই মতো) যে, ইন্দ্রিয়োজ্জ্বল রোম্যান্টিকদের পাশে অনেকখানি ফিকে লাগে অডেন-স্পেণ্ডারদের মতো আধুনিকদের!

বিপর্যয়ের এত সমতা সত্ত্বেও ইয়েটসের সংকলন আর রবীন্দ্রনাথের সংকলন অবশ্য সর্বাংশে তুলনীয় নয়। আমাদের বাংলা বইটিতে ভারসাম্যের যে শোচনীয় অভাব, অনেক খামখেয়াল সত্ত্বেও ইয়েটসের সংগ্রহটি নিশ্চয় ততখানি মর্মান্তিক নয়। উপরন্তু, বিরূপ এত প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও ইয়েটসের খানিকটা আত্মপ্রসাদ ছিল এই যে, বইটি বিকোচ্ছে ভালো। তিন মাসে পনেরো হাজার বিক্রি, গ্লাসগো আর এডিনবরায় বেস্ট সেলার, উৎসাহী ইয়েটস থেকে-থেকেই জানাচ্ছেন ‘My Anthology continues to sell’; আর রবীন্দ্রনাথের ‘বাংলা কাব্যপরিচয়’—ছাপা হবার অল্প ক’দিনের মধ্যেই—তুলে নিতে হলো বাজার থেকে।

৩

দুর্গ্রহের ভর ছিল সূচনা থেকেই। আদিরসের কবিতা না থাকায় সুবিধে হলো যে ‘এই বই অসংকোচে ও নির্বিচারে সর্বজনের হাতে

দেওয়া যেতে পারে।' বুদ্ধদেব প্রশ্ন করেছিলেন, এই সর্বজন কারা? বসুমতীর পাণ্ডারা? ভূমিকায় কথাটা ওভাবে বলা থাকলেও সংকলনটির পরিকল্পনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ইস্কুলপাঠ্য বই হিসেবেই। বইটির গঠনপর্বে, কবিতাগুলি থেকে সম্ভাব্য প্রশ্নাবলীর এক তালিকাও তৈরি করে রেখেছিলেন তিনি, শেষ পর্যন্ত সেটি মুদ্রিত হলে এর ইস্কুলগন্ধ হয়তো আরো একটু প্রকাশ্য হয়ে উঠত। এই প্রশ্নগুলি ছাড়া, পরিশিষ্টে ছাপা হবার কথা ছিল আরো একটি আলোচনা, নন্দগোপাল সেনগুপ্তের লেখা। কিন্তু এই লেখা নিয়েই হঠাৎ আপত্তি তুললেন বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

রবীন্দ্রনাথেরও মনে হলো সংগত এই আপত্তি। কেননা 'এতে বাঙালি পাঠক অসুস্থ ও অশান্ত হয়ে পড়বে, যেহেতু এ বই সাধারণ পাঠকমণ্ডলীর জন্যে, সে কারণে অপ্রিয় সত্য এর উপযোগী নয়। বিদ্যালয়পাঠ্যরূপে গ্রাহ্য হবারও নিশ্চিত বাধা ঘটবে। তাই আমি বিস্ফোরক লাইনগুলি তুলে দিলাম।' অপ্রিয় সত্যটি ছিল হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় -সম্পর্কিত কোনো মন্তব্যে, সেটা ছাপা হয়ে গেছে তখন। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে ভাবছেন পাতাটি পালটে দেবার কথা, পরে ভাবছেন যে বাতিল করা যাক পুরোটাই। হলোও তাই, আদর্শ প্রশ্ন বা আলোচনার কিছুই আর ছাপা গেল না, প্রকাশক জানালেন, 'কাব্যপরিচয় শেষ পর্যন্ত, পরিশিষ্ট বাদ দিয়েই প্রকাশ করা স্থির হলো', রবীন্দ্রনাথ মনে করলেন যে সহকারীদের বিষয়ে তাঁর অসতর্কতার 'দণ্ড দিতে হলো' এইভাবে।

কবিতা সাজাইবাছাই করবার কাজে, অনুলিপি করবার কাজে, তথ্যসংগ্রহের কাজে তাঁকে যে সাহায্য করেছিলেন নন্দগোপাল, কাননবিহারী আর গ্রন্থনবিভাগের কিশোরীমোহন সাঁতরা, সে

বিষয়ে সন্দেহ নেই কোনো। কিন্তু এ সাহায্যের প্রতিটি স্তরে কবির প্রত্যক্ষ অনুমোদন নিতে হচ্ছে তাঁদের এইভাবে : 'সজনীকান্ত দাসের দুটি কবিতা আমাদের সংকলনে গিয়েছে, আপনি আরো ২/১টি কবিতার কথা বলেছিলেন' অথবা 'এই কবিদের মধ্যে থেকে যাঁর কবিতা নেওয়া আপনি দরকার মনে করবেন তাঁদের নাম অনুগ্রহ করে পাঠাবেন' বা এইরকমের আরো অনেক মন্তব্য।

এতসব আয়োজনের মধ্যে বইটি যখন বেরোবে বলে তৈরি প্রায়, নূতন একটা প্রশ্ন উঠল তখন। সংকলন করছেন রবীন্দ্রনাথ, সকলে তাই ধরে নিয়েছিলেন যে গৃহীত কবিদের অনুমতির কোনো প্রয়োজন নেই আর। কিন্তু বিরোধী একটা জট দেখা দিচ্ছে চার-পাশ ঘিরে, এমন কথাও উঠছে যে 'বই বাজারে প্রকাশিত হলেই আমাদের নামে উকিলের চিঠি' পৌঁছতে পারে, ফলে দ্রুত একটি অনুমতিপত্রের ফর্ম ছাপিয়ে কবিদের কাছে পাঠাবার আয়োজন করছেন কিশোরীমোহন, বই প্রকাশের দিন-দশেক আগে। অন্যদের আর কী কথা, রবীন্দ্রনাথের আপনজনেরাই তখন বেঁকে বসলেন একটু। 'সত্যই সম্মতিলাভের জন্য এই পত্র, না বাহিরের ভদ্রতা মাত্র?' প্রশ্ন করলেন যতীন্দ্রমোহন। সব ছাপা হয়ে যাবার পর হঠাৎ কেন এই চিঠি, জানতে চাইলেন প্রমথনাথ বিশী। জীবনময় রায় বললেন তাঁর সম্পূর্ণ আপত্তি তাঁর কবিতা ছাপানোর বিষয়ে। আর সুধীন্দ্রনাথ লিখলেন তাঁর কবিতা যে-বই থেকে নেওয়া 'তাতেও ওটাই নিকৃষ্টতম। সুতরাং ওই কবিতাটা সংকলন থেকে বাদ দিলে অনুগৃহীত হব।'

এসব খবর এসে পৌঁছয় রবীন্দ্রনাথের কানে, ঈষৎ বিচলিত তিনি, দিন কাটাচ্ছেন মংপুতে। বারোই জুন কাননবিহারী তাঁকে

জানাচ্ছেন যে 'বাংলা কাব্যপরিচয়' নিয়ে কলকাতায় নাকি হৈ-চৈ পড়ে গেছে। 'গত দুদিনে যেখানেই গেছি খুব সুখ্যাতি শুনছি। মনে হয়, খুব শীঘ্র হয়তো প্রথম সংস্করণ বিক্রি হয়ে যাবে।' শুনে রবীন্দ্রনাথ আশ্বস্ত হন অনেকখানি। কিন্তু মুশকিল এই যে বইটি প্রকাশ্যে দেখা দিল এই চিঠিখানি লিখিত হবার পরের দিন মাত্র। তেরোই জুনের দুপুর একটায় শুরু হলো বিক্রি, সন্ধের মধ্যেই ফুরোল অবশ্য আঠারোটি বই। আর, এর অল্প পরেই, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কাছ থেকে চিরকুট নিয়ে এল দূত, শুরু হলো আরেক সংকট।

ভুল ছাপা হয়েছে যতীন্দ্রমোহনের নাম, কৈফিয়ৎ চান তিনি। জীবনময় এবং সুধীন্দ্রনাথকেও সংবৃত করা শক্ত। প্রয়াত দ্বিজেন্দ্র-নারায়ণ বাগচীর ছেলে দ্বিপেন্দ্র একহাজার টাকা ক্ষতিপূরণের দাবি নিয়ে হাজির, অনুমতি ছাড়াই কবিতা ছাপা হয়েছে বলে। কী করা যাবে এবার ? দু-একটি পাতা বর্জন করে নূতনভাবে ছাপিয়ে নেওয়া যায় আবার ? সঙ্গে-সঙ্গে জীবনময়ের বদলে সংগৃহীত হলো নিরুপমা দেবীর একটি কবিতা। সেই পাতাটি নূতন করে ছাপিয়ে নেওয়া হলো দ্রুত, এঁটে দেওয়া হলো জায়গামতো, আগের পাতাটি কেটে। নূতন একটি নিবেদন-পৃষ্ঠারও যোগ হলো সূচনায়, যেখানে স্বীকার করা হলো এ-সংস্করণের অনেক অভাবের কথা, যেখানে ভরসা দেওয়া হলো যে ভবিষ্যৎ কোনো সংস্করণে এ বই 'পূর্ণতা ও উৎকর্ষ লাভ করবে এই প্রত্যাশা সংকলনকর্তার মনে রইল।' কিন্তু এতসব সত্ত্বেও, মাত্র কয়েকটা দিনের মধ্যে একই সংস্করণের দুই ভিন্নরূপ তৈরি হওয়া সত্ত্বেও, বিরূপ প্রতিক্রিয়ার বহর দেখে বন্ধ করে দিতে হলো বেচা-কেনা, ঠিক হলো যে ছাপা হবে আদ্যন্ত সংশোধিত এর দ্বিতীয় সংস্করণ।

এইবার, দ্বিতীয় সংস্করণের এই পথ দিয়ে এসে পৌঁছবেন সজনীকান্ত দাস।

৪

তরুণ কবিদের কবিতা নেবার বিরুদ্ধে একটা প্ররোচনাই চলছিল ভিতরে ভিতরে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা গ্রাহ্য করেননি বড়ো। 'মানুষ রবীন্দ্রনাথ' বইটিতে জানাচ্ছেন কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় : 'তিনি এই কথা বলে তাঁদের যুক্তিতর্ক খণ্ডন করতেন যে বয়সে কাঁচা বলেই তাদের লেখা বাদ দেব কেন। দু'একবার কারো কারো সম্বন্ধে আমি নিজেই অভিযোগ জানিয়েছি, এঁরা শুধু বয়সে কাঁচা নন লেখাতেও কাঁচা যে। এঁদের কবিতা কেন নিচ্ছেন? কবি জবাব দিয়েছিলেন, তেমন পাকা লেখা নয় বটে কিন্তু লেখার মধ্যে নতুন একটা চেষ্টা তো রয়েছে, তাকে অশ্রদ্ধা করি কেমন করে? অনেক সময়ে তরুণ কবিদের সম্বন্ধে তাঁর বিচার মেনে নিতে পারিনি। মনে হয়েছে, কবি অযথা এঁদের উৎসাহ দিয়েছেন।'

কিন্তু উৎসাহ দেবার এত চেষ্টার ফল যখন হলো উলটো, যখন সেই তরুণদের কাছ থেকেই আসতে লাগল আঘাতের পর আঘাত, চিঠিতে অথবা প্রকাশ্য সমালোচনায়, তখন দ্বিতীয় সংস্করণে রবীন্দ্রনাথ আর ঝুঁকি নিতে চাইলেন না কোনো। এইবারই তিনি মনে করলেন যে নির্বাচনে কারো প্রত্যক্ষ সহায়তা চাই। আর সে কাজে তিনি যোগ্যতম মনে করলেন সজনীকান্ত দাসকে, জানালেন তাঁকে : 'আমি শান্তিপ্রয়াসী, খররসনার আস্ফালনে ভীত। সাহিত্যে অত্যন্ত যাঁরা প্রত্যন্তদেশীয় তাঁরাও আমাকে ভয় করেন না। সেইজন্যেই অন্ত্যবর্গের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ভার

তোমারই উপর।' যথার্থই অন্ত্যেষ্টির আনন্দে এগিয়ে এলেন সজনীকান্ত।

বই প্রকাশিত হবার অল্প পরেই যে সংকট, তখনই শুরু হয়েছিল সজনীকান্তের আসা-যাওয়া। যে-সব কবির লেখা নেই, ঠিকানা-সুদ্ধ তাঁদের একটা তালিকা তৈরি করে দিয়েছেন তিনি, কবির 'কোনো কাজে বা সাহায্যে আসতে পারেন কিনা এ বিষয়েও বারবার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।' এই আগ্রহের ফল হলো পঁচিশে জুলাইতে লেখা রবীন্দ্রনাথের চমকপ্রদ এই দলিলটি :

'I hereby appoint a Board consisting of Sj. Sajanikanta Das, Hironkumar Sanyal, Nandagopal Sengupta and Kishorimohon Santra with Sj. Charuchandra Bhattacharya as Secretary to advise me in the selection of poems for the revised second edition of বাংলা কাব্যপরিচয়. I hope they will kindly accept the office.' এই দলিলের অন্য নামগুলি আলংকারিক, অফিসিয়াল ; নূতন নাম এল কেবল সজনীকান্তের।

ক্ষুব্ধ তরুণদের রবীন্দ্রনাথ এবার সান্ত্বনা দিচ্ছেন আশুপ্রকাশ্য দ্বিতীয় সংস্করণের দোহাই দিয়ে, আর সজনীকান্তকে বোঝাচ্ছেন সমস্যার জটিল প্রকৃতি। 'বুদ্ধদেব উত্তেজিত, দিলীপ দুঃখিত, সুধীন্দ্র খ্যাপা। তাদের কবিতা তাদের দিয়েই বাছাই করতে দেওয়া চলে কিনা ভেবে দেখো' বলছেন সজনীকে। আদিরসের বাহনটিকেও যেন প্রয়োজন আছে বলে মনে হচ্ছে এবার। রবাহূত অনাহূতদেরও যথাসম্ভব ডেকে নেওয়া ভালো বলে ভাবছেন। কবিসমাজের মেজাজ জেনে ত্রস্ত রবীন্দ্রনাথ ঠিক করছেন 'এখন থেকে শক্ত হস্তেন

কবিনাম্', এরা নাকি 'তীক্ষ্ণচঞ্চু ঝগড়াটে জাত', এদের 'হিটলারি উষ্মা' নিবারণ করতে হবে এক 'চেম্বারলেনি পদ্ধতি'তে। কিন্তু এবার তিনি নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছেন একটু দূরে, সবসুদ্ধ এবার যে লড়াই হবে তা দেখবেন তিনি দূর থেকেই, 'তাতে কৌতুক আছে'। তবে সজনীকান্তের নাম জানাবেন না বাইরে। কেননা তাতে এই তরুণেরা হয়তো 'অসুস্থ হয়ে পড়বেন।'

ফলে, প্রশ্রয়মুগ্ধ সজনীকান্ত এ কথা জানাতে আর ভয় পান না যে 'যারা সত্যিকারের কবিতা লিখতে পারে না তারাই খেপেছে বেশি।' কারা তারা? সুধীন্দ্রনাথ-বুদ্ধদেবরাই তো আপত্তি জানাচ্ছিলেন সবচেয়ে বেশি, আর এটা স্বাভাবিক যে সজনীকান্তের মনে হবে এঁরা কবিতা লিখতে পারেন না। আধুনিকদের সঙ্গে সজনীকান্তের এই সম্পর্কটা যে রবীন্দ্রনাথের জানা ছিল না তা নয়, তবু এঁরই হাতে বইটির 'দ্বিতীয় দেহান্তরে'র জন্য অধীর বোধ করছেন তিনি। আদি আর মধ্যযুগের কাজ শেষ হয়ে এসেছে নভেম্বরের মধ্যেই, কিন্তু তা নিয়ে বড়ো উৎকণ্ঠা ছিল না রবীন্দ্রনাথের। তাই সজনীকান্ত ভরসা দেন তাঁকে: 'রবীন্দ্রোত্তর যুগের একটা খসড়া নিয়ে আপনার চ্যাঁড়াসই নিয়ে আসব, ওখানে আমারও ভয় আছে আমি নিজে ওর মধ্যে আছি বলে।'

অর্থাৎ, এই দ্বিতীয় সংস্করণটি যদি ছাপা হতো শেষ পর্যন্ত, তাহলে স্পষ্টতই সেটা হতো সজনীকান্তের সংকলন, রবীন্দ্রনাথ হতেন শিখণ্ডী। এরই খবর নিশ্চয় ছড়িয়ে পড়েছিল গুজবের চেহারায়, যার নমুনা আমরা ধরতে পারি সমর সেনের স্মৃতিচারণে। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে বছরটা শেষ হবার পর এই দ্বিতীয় সংস্করণ নিয়ে বড়ো আর শুনতে পাই না আলাপ, হঠাৎ যেন ভেঙে গেল

বই ছাপানোর প্রস্তাব। তাঁর 'আত্মস্মৃতি' বইতে সজনীকান্ত দাবি করেন যে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি তিনি অর্পণ করেছিলেন বিশ্বভারতীর দপ্তরে, ডিসেম্বরের গোড়াতেই, কিন্তু কোথায় সে ফাইল আজও পর্যন্ত তার হদিস নেই কোনো। রবীন্দ্রনাথ কি খুব বেশি উৎসুক ছিলেন আর? একটি চিঠিতে যখন তিনি সজনীকে লিখছেন যে তাঁদের কাজ তো তাঁরা করেছেন, এখন দায় প্রকাশকের – তখন সেটাকে মনে হয় যেন প্রবোধ দেবার ধরন একটা, আরো-কোনো জটিলতার সম্ভাবনা থেকে নিজেকে যেন সরিয়ে আনার ছল।

৫

দীর্ঘকাল আগে ছাপা হয়েছে যে-বই, বাজার থেকে যা তুলে নিতে হয়েছিল এক মাসের মধ্যেই, আজকের দিনের পাঠকেরা যে-বই দেখতেও পান না সহজে, তার এই কাহিনী শুনে কী লাভ আমাদের? এ কি কেবল ইতিহাসচর্চা? জাদুঘরের সামগ্রী দেখার কৌতূহল শুধু?

খানিকটা হয়তো তাই, কিন্তু পুরোটাই নয়। আলোড়িত ওই দিনগুলির ইতিবৃত্ত আমাদের আরো একটা দিককে লক্ষ করতে বলে, প্রশ্ন করতে বলে রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতার বিচার প্রসঙ্গে। অমিয় চক্রবর্তীর কাছে লেখা চিঠিগুলিতে, কিংবা সুধীন্দ্রনাথ-বুদ্ধদেবের কাছে লেখা চিঠিপত্রেও, তাঁদের রচনা বিষয়ে অনেক স্তুতিবাক্যের উচ্চারণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। দ্বিধা যে কিছু ছিল তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু বুঝে নেবার গরজও তাতে দেখান কবি অনেকটা। এই কি সেই বুঝে নেবার চেষ্টা? আধুনিক পর্ব নিয়ে সংকট তৈরি হলো যখন, তখন তিনি পরামর্শ চাইলেন না তাঁর এতটা নির্ভরস্থল

অমিয় চক্রবর্তীর কাছে, ভর করতে পারলেন না সুধীন্দ্রনাথের কথায়, বুদ্ধদেব না-হয় অপকীর্তিত দূরের মানুষ। আর এঁদের পরিবর্তে ডেকে নিলেন তিনি সেই সজনীকান্তকে, আধুনিকদের ব্যঙ্গবিদ্ধ করাই যাঁর প্রধানতম ব্যসন। 'অকবি সম্পাদকের চাইতে কবি সম্পাদকের কাছে আমাদের শিক্ষণীয় অনেক বেশি' বড়ো আশা করে বলেছিলেন বুদ্ধদেব। কিন্তু সেই শিক্ষায় কি এই হলো যে সুধীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতা বলে ধরতে হলো 'অধুনা-আনীত নব অলিখিত/ লেখনী মোর'? মনে রাখতে হবে যে রাবীন্দ্রিক এই সংকলনের আগে ছাপা হয়ে গেছে 'অর্কেস্ট্রা' আর 'ক্রন্দসী'। মনে রাখতে হবে, জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'ও তখন পৌঁছে গেছে পাঠকদের হাতে। বেরিয়ে গেছে বিষ্ণু দে-র 'চোরাবালি', বুদ্ধদেবের 'বন্দীর বন্দনা' বা 'কঙ্কাবতী' আর অমিয় চক্রবর্তী বা সমর সেনেরও অনেক স্মরণীয় কবিতা। 'বাংলা কাব্যপরিচয়' পড়ে সে কথা জানবার উপায় থাকে না কোনো, উপায় থাকে না এ কথা বিশ্বাস করবার যে সত্যিকার কোনো অভিনিবেশ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বুঝতে চেয়েছিলেন তরুণদের কবিতা। সম্পাদনার এই কাজ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে অনেক ইংরেজি সংকলন নাকি পড়তে হয়েছে, ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন: জানিয়েছেন যে 'তুলনায় খুব বেশি সংকোচ বোধ করিনি।' এ-কথা কি সত্যি হতে পারে যে পলগ্রেভ কুইলার-কোচ বা ইয়েটসের সম্পাদিত সংকলনের তুলনায় রবীন্দ্রনাথ একেবারেই সংকোচ বোধ করছেন না গিরিজাকুমার বসু সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সুধীরচন্দ্র কর ছায়াদেবী বা হাসিরাশি দেবীদের কবিতা সংগ্রহ করে? আধুনিক বা রোম্যান্টিকের প্রশ্নটাও বড়ো নয় এখানে, বিচলিত বোধ করি আমরা কবিতারুচিরই মৌলিক প্রশ্নে। অন্য

একটি বাংলা সংকলন বিষয়ে বুদ্ধদেব মন্তব্য করেছিলেন যে বইটি কিছু বলে না, 'বইটি বোবা ও ব্যর্থ'। রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা কাব্য-পরিচয়'ও ব্যর্থ বটে, কিন্তু একেবারে বোবা হয়তো নয়। সাময়িক রুচিবিপর্যয়ের এক রোমাঞ্চকর গল্প সে আমাদের বলে, রবীন্দ্রনাথের মনে আধুনিকতার সংকট কোন্ পথে চলছিল তা বুঝতেও সে আমাদের সাহায্য করে খানিকটা।

পাউণ্ডের একটি গল্প

একবার এক বাঁকা গল্প লিখেছিলেন এজরা পাউণ্ড, যে গল্পের নায়কের নাম ছিল যদীন্দ্রনাথ মণ্ডহর। নামটাই একটু চমকে দেয় আমাদের। যদীন্দ্রনাথ? কাউকে কি ইঙ্গিত করছেন পাউণ্ড? হঠাৎ এরকম নাম নির্বাচন করলেন কেন? কিছু কৌতূহল কিছু-বা উৎকণ্ঠা নিয়ে গল্পের ভিতর দিকে এগোলে দেখি, নিতান্তই একজন ধ্যানী পুরুষ এই যদীন্দ্রনাথ, শাস্ত্রে এর অপার নিষ্ঠা আর মুখে বলেন কোনো-এক বিশ্বদেবতার কথা। বহুপুত্রক পিতার এই সন্তানটি পৈতৃক সম্পদে বলীয়ান। বিরাট তাঁর বাড়ি, এক-এক ধরনের ক্রিয়া-কীর্তির জন্য এক-এক ধরনের ঘর, ঘরে আছে গন্ধবিলাস, আর আছে দু-চারখানি বই।

এই চালেই তারপর চলতে থাকে পুরো লেখাটি। অবশেষে 'বাঙালি' শব্দটিকেও আমরা পেয়ে যাই গল্পে। জানতে পারি, শাস্ত্র এবং সূত্রের উপর নির্ভরশীল এই নায়ক একই সঙ্গে ধ্যান ও নারী-সঙ্গের চর্চা করেন। খুব বেশি বই পড়েননি ইনি, তবে যতটুকু পড়েছেন তার থেকেই চলে যায় তাঁর সংলাপ, সে-সব আলাপ বেশ মামুলি হলেও কোনো ভ্রূক্ষেপ করেন না তিনি। বারো বছরের ছেলেকে ইনি দীক্ষা দেন জীবন বিষয়ে, কিন্তু কখনোই ভেঙে বলেন না কতটা তাঁর নিজের কথা, কতটা-বা প্রাচীন ঋষিদের হাতফেরতা পাওয়া। ছেলেকে আদর করে ডাকেন তিনি 'flower of my life, lotus-bud of the parent stem!'

এই পর্যন্ত শুনে আমাদের সংশয় কি আরো একটু ঘনিয়ে ওঠে না? তবে কি একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে রবীন্দ্রনাথকেই ইঙ্গিত করছেন পাউণ্ড? যদীন্দ্রনাথ মণ্ডহর কি রবীন্দ্রনাথ টেগোরেরই অপভ্রষ্ট রূপ?

নামের দুটি অংশই রবীন্দ্রনাথকে মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু কেবল এই নামসাদৃশ্যই নয়। যে-কটি বিদ্রূপ ছুঁড়ে দেওয়া আছে রচনাটির মধ্যে, তার কয়েকটি যে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে উঠে আসা অসম্ভব নয়, এ-রকম একটা আশঙ্কা মনে জাগে। প্রাচীন শাস্ত্রের উপর নির্ভরশীলতা, পুরোনো ধাঁচের অলংকারে কথা বলা, অথবা ছদ্ম এক সন্তমহিমায় কেবলই সাজিয়ে রাখা নিজেকে : আমরা জানি যে এই সবই একদিন হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে তাঁর পশ্চিমের ভক্তদের অভিযোগ। 'He teaches such a comfortable philosophy : just have a good time and love everybody and your soul will migrate and migrate and migrate until finally it pops off into the Infinite! The pearl slips into the lotos'—১৯১৫ সালেই এই ধরনের অভিযোগ হচ্ছিল 'আমেরিকা'র মতো কোনো পত্রিকায়। আর এইসব অভিযোগ প্রথম যাঁরা তুলেছিলেন, তাঁদেরই একজন ছিলেন এজরা পাউণ্ড।

কিন্তু, পাউণ্ড কি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগীই ছিলেন না এক সময়ে? এ কথা তো আমাদের সবারই জানা যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পাশ্চাত্য অনুরাগীদের মধ্যে পাউণ্ডই ছিলেন সবচেয়ে হৈ-চৈ-প্রবণ। ১৯১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই হ্যারিয়েট মনরো-কে তিনি 'এই শীতের চাঞ্চল্য' পাঠাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথের কবিতার খবর দিয়ে, অক্টোবরে

লিখছেন 'this is the scoop', গর্ব করে জানাচ্ছেন যে 'পোয়েট্রি'তে থাকবে রবীন্দ্রনাথের ছটি কবিতা, আর, অন্য কোথাও থাকবে না একটিও! এসব কবিতা বেরোবার সঙ্গে-সঙ্গেই ছাপা হয়েছিল যেন এদের ভূমিকা হিসেবে পাউণ্ডের বন্দনা। আর, বই ছাপা হবার পরে যে দীর্ঘ প্রগাঢ় অনুগত সমালোচনা লিখেছিলেন পাউণ্ড, কবিতা-সমালোচনার আদর্শ হিসেবেও সেটি স্মরণীয়। তাঁর পক্ষে কি সম্ভব রবীন্দ্রনাথকে অবজ্ঞা জানাবার জন্যেই 'Jodindranath Mawhwor's Occupation' লেখা, ১৯১৭ সালেই?

ওই বছরের মে মাসে লেখাটি ছাপা হয়েছিল 'দি লিট্‌ল্‌ রিভিউ' পত্রিকায়। এই মাস থেকেই পাউণ্ড নির্বাচিত হন এ-পত্রিকার 'ফরেন করেসপণ্ডেন্ট' হিসেবে। এই-পত্রিকা অথবা এর সম্পাদিকা মার্গারেট অ্যাণ্ডারসেন যে সমকালীন আরো কোনো প্রতিষ্ঠানের মতো রবীন্দ্রনাথের প্রতি স্বভাববিরূপ ছিলেন, এমনও নয়। দু'বছর আগেই জুলাই মাসে এখানে অনুকূল আলোচনা লিখেছেন আর্নেস্ট রীস, 'চিত্রা' (চিত্রাঙ্গদা) বিষয়ে অমলিন প্রশস্তি বেরচ্ছে ১৯১৪ সালে, ঠিক-ঠিক সময়ে প্রকাশিত হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের নতুন-কোনো বই বেরনোর খবর অথবা এই পত্রিকা থেকেই আমরা সময়মতো জানতে পাই যে ইংরেজি বেস্ট-সেলারের তালিকায় 'গার্ডনার'-এর জায়গা হলো চার নম্বর। তাহলে হঠাৎ এঁরাই-বা কেন ছাপবেন এমন-কোনো-রচনা যা স্পষ্টতই রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করে লেখা?

আবার অন্য দিক থেকে কথাটা ভেবে দেখা যায়। পাউণ্ডের পক্ষে ব্যাপারটা কি অসম্ভব ছিল একেবারেই? রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তিনি যতটা উচ্ছ্বাস একদিন প্রকাশ করেছিলেন, ততটাই কি আবার ফিরিয়ে নিতে চাননি পরে? ১৯৫২ সালেও 'The Unwobbling

Pivot and the Great Digest of Confucius' বইয়ের উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় কবি অমিয় চক্রবর্তীকে লিখেছিলেন অবশ্য পাউণ্ড : রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা পড়ে শোনাচ্ছেন, চার দশকের ওপার থেকে ভেসে-আসা এই স্মৃতি তাঁর জীবনবৃত্তান্তে বড়ো একটা তুচ্ছ কাণ্ড নয়। কিন্তু তাহলেও আমরা জানি যে তাঁর মন বেঁকে গিয়েছিল ১৯১৬ সাল থেকেই। একদিকে ফেনোলোসার পাণ্ডুলিপি থেকে জাপানি নাটকের মহিমময় ঐতিহ্যের সন্ধান মিলছে, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথেরই হাত থেকে এসে পৌঁছল কবীরের অনুবাদ—যেন মোহভঙ্গ হলো পাউণ্ডের বা ইয়েটসের। উপরন্তু রবীন্দ্রনাথ, হিতৈষীদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে, নিজের কবিতার এমন অনুবাদ ছাপিয়ে চলেছেন যার বিশেষ আর মূল্য হবে না ওদেশে, এইরকম ভয় পাচ্ছিলেন ওঁরা। এটা লক্ষ করবার বিষয় যে ১৯১৭ সালের আগস্ট মাসে 'দি লিট্‌ল্ রিভিউ' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল পাউণ্ডের আরো একটি লেখা, দুটি বইয়ের সমালোচনা। 'Certain Noble Plays of Japan' এবং 'Noh, or Accomplishment' বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে পাউণ্ড যেন অনিবারণীয় ভাবে তুলে আনলেন রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ, অর্থাৎ আরো একজন প্রাচ্য শিল্পীর কথা, এবং তুলনায় জানালেন যে জাপানি ওই-সব লেখা হলো 'infinitely better than Tagore and the backwash from India.... Fenollosa has given us more than Tagore has'। আর এই তুলনাকে যেন কেউ না ভেবে বসেন বিদ্বেষপ্রসূত, সেইজন্যেই পাউণ্ড মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে তিনিই একদিন ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রথম ধ্বজাবাহী।

কেন পাউণ্ডের এই মতিবদল হলো—অথবা ইয়েটসের—তা

নিয়ে বিস্তর গবেষণা আমরা শুনেছি। তবে মতিবদল যে হয়েছিল সেটা দ্বিধাহীন ভাবেই বলা যায়। এই পরিবর্তনের ফলেই হয়তো বহু পরবর্তী এক সাক্ষাৎকারে তরুণতর কবি ডোনাল্ড হল্-কে তিনি বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথের চিত্রবিদ্যা প্রসঙ্গে 'I remember when Tagore had taken to doodling on the edge of his proofs, and they told him it was art!' এই পরিবর্তনের ফলেই, ইয়েটসের মতো পাউণ্ডও, বলেছিলেন যে ইংরেজিটা এঁর তেমন সুবিধের নয়। আর সেই সূত্রে উল্লেখ করেছিলেন 'sun-shine in my soul'-জাতীয় কোনো-কোনো ক্লিশের কথা, সেই সূত্রেই বলতে চেয়েছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ এখন হয়ে দাঁড়িয়েছেন 'the prey of religiose nincompoops'!

এখন, এই ধর্মীয়তা, ক্লিশে প্রয়োগের ধরন, তাঁকে নিয়ে বাণিজ্যিক জগতের ছিনিমিনি খেলা : এসব থেকে পশ্চিমের কবিদের মনে যে বিরক্তি তৈরি হচ্ছিল, তার প্রভাবে রবীন্দ্রনাথকে যদীন্দ্র-নাথের উপহাস্য বেদীতে বসিয়ে দেখা কি পাউণ্ডের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব ছিল? তার মানে এ নয় যে এ গল্পের প্রতিটি শব্দই সেই একই বিরক্তির চিহ্ন। এ নিশ্চয় সত্যি যে এর সঙ্গে এসে মিশেছিল ব্যাপক ধর্মীয় ভণ্ডতার প্রতি পাউণ্ডদের আক্রমণ। এও নিশ্চয় ঠিক যে কামসূত্র এবং নারীলিপ্সার ঠাট্টায় আমাদের বরং মনে পড়বে মলিয়েরকে, তাঁর তার্তুফ চরিত্র। কিন্তু ওরই সঙ্গে যখন পড়ি এই ধরনের সব মন্তব্য 'clove to the god of this universe' 'belonging to the days of his favourite author than to our own' 'proceeded to the classical plays, though their representatives have sadly

diminished' কিংবা 'the evening was given over to singing' আর 'accept the old authors freely' তখন তার মধ্যে কি মিশে যায় না রবীন্দ্রনাথ বিষয়েই তাঁর মনোভাব? 'Flower of my life' 'lotus-bud of parent stem' অথবা 'my blue lotus' থেকেও কি রাবীন্দ্রিক অলংকরণের কথাই মনে পড়ে না আমাদের? 'লোটাস' শব্দটি যে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি অনুবাদে খুবই বেশি এসেছে তা নয়; আর তাছাড়া, একদিন তো 'ফোর্টনাইট্‌লি রিভিউ'তে সেই শব্দকেও পাউণ্ড দেখেছিলেন কত শ্রদ্ধাভরে। কিন্তু তাহলেও পাউণ্ডের গল্পে ওই শব্দগুলি মনে করিয়ে দেয় জাপানি নাটকের আলোচনা-প্রসঙ্গে কেমনভাবে পাউণ্ড লাঞ্ছিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ ক্লিশে-প্রয়োগকে, কেমনভাবে বলছিলেন: his first draft contained such cliché's as 'sunshine in my soul'। এটা ঠিকই যে কবির অনুবাদে এসে পৌঁছচ্ছিল 'O thou bloodred rose, my poppies of sleep have paled and faded' (*Fruit-Gathering*, XXXV) কিংবা 'I offer to thy service those flowers of my love' (*F.-G.* XLVI)-এর মতো অস্বস্তিকর শব্দমালা।

এই নিয়েই কি পাউণ্ডের ঠাট্টা? অন্তত এটা ঠিক যে ১৯১৭ সালের পর, এই গল্পটি লেখার পর, মন খুলে আর রবীন্দ্রনাথের কথা বলেননি পাউণ্ড। যেন এই হলো তাঁর প্রায়শ্চিত্ত। একদিন যে আবেগের অতিরেকে রবীন্দ্রনাথকে তিনি ভেবেছিলেন একমাত্র দান্তেরই সঙ্গে তুলনীয়, সেই অপরিণামদর্শী ধৃষ্টতাকে প্রত্যাহার করে নেবার জন্যেই যেন আরেক আতিশয্যময় ধিক্কার আজ। সেই

ধিক্‌কারই যেন অল্প পরিমাণে প্রচ্ছন্ন রইল 'যদীন্দ্রনাথ মণ্ডহর'-এর মতো কোনো নামে। নো-নাটকের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের কথা উঠেছিল যখন, পাউণ্ড তখন ঠাট্টা করেছিলেন বাবু-প্রেসকে। যদীন্দ্রনাথের গল্পটিতেও গত শতাব্দীর বাবু-সভ্যতার এক ছবি আঁকা রইল স্পষ্ট। এইভাবে, পাউণ্ডের কাছে, ক্রবাদুর থেকে এক বাবুর জগতে পৌঁছে গেলেন রবীন্দ্রনাথ, একেবারে হঠাৎ।

কোষবদ্ধ রবীন্দ্রনাথ

কবি অডেন নাকি উইল করে গেছেন যে তাঁর চিঠিপত্র ছাপানো চলবে না একেবারেই, আত্মীয়বন্ধুরা যেন পুড়িয়ে ফেলেন সব। শুনে ঠাট্টা করেছেন তাঁর বন্ধু স্পেণ্ডার, বলেছেন 'লিখতেন তো ভারি উনি দু-তিন-লাইনের চিঠি!' কিন্তু তথ্যসন্ধানী মানুষের কাছে দু-তিন-লাইন কি কম কিছু? আসল কথা এই যে, কবিতার জন্য কবিজীবনের কোনো তথ্য জানবার দরকার আছে বলেই ভাবতেন না অডেন।

সবাই আমরা জানি যে কবিজীবনী বিষয়ে রবীন্দ্রনাথেরও মত ছিল ওইরকম। টেনিসনের ছেলের লেখা টেনিসন-জীবনী বা গর্কির লেখা টলস্টয়-জীবনী অথবা প্রভাতকুমারের লেখা রবীন্দ্র-জীবনী: এই সব-কিছুই বিরক্ত করছিল তাঁকে। রবীন্দ্রনাথের নয়, দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্রের জীবনী লিখেছেন প্রভাতকুমার, এই রকম এক মন্তব্য করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

তাই বলে অবশ্য তথ্যের প্রয়োজন ফুরোয় না। স্যাঁতব্যোভ বা বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণাকে যদি গণ্য নাও করি, যদি ধরে নেওয়া যায় যে কবিতা বুঝবার কাজে কিছুই দরকার হয় না জীবনবিষয়ক খবরের, তবু তথ্যের জন্যই তথ্য জেনে রাখাটা মন্দ কী?

উত্তরে কেউ বলতে পারেন হয়তো: মন্দ এই যে, বেশি জানতে গেলে বেশি ভুল জানবার সম্ভাবনা। যেসব বইকে বলা যায় খবরের জাহাজ, সেই কোষগ্রন্থগুলি হাতে নিলে যে হাত

কাঁপতে থাকে সে কেবল তার ওজনের জন্য নয়, খানিকটা সংশয়ের উত্তেজনাতেও বটে। বইটির উপর নির্ভর করা চলবে তো? বইটি ঠিক-ঠিক খবর বলবে তো? কী করে তা বুঝবেন সাধারণ একজন পাঠক? তাঁর পরিচিত কোনো প্রসঙ্গ একবার খুলে দেখতে পারেন তিনি, আর সেখানে যদি ভয়ের কিছু চোখে না পড়ে তো অল্প একটু সাহস বাড়ে তাঁর। কিন্তু, খুব কম ক্ষেত্রেই এরকম সাহস পাওয়া যায়। অন্তত, রবীন্দ্রনাথ নিজে কবিজীবনের তথ্যে বেশি বিশ্বাস করতেন না বলে কোষগ্রন্থগুলি তাঁর উপর শোধ নিয়েছে খুব: এমন কোনো বিশ্বকোষ খুব কমই মেলে যেখানে তাঁকে নিয়ে কোনো-না-কোনো উৎকট তথ্যের উল্লাস দেখা যাবে না।

লেখার মধ্যে অন্যমনস্ক দু-একটা ভুল ঘটতেই পারে কারো। না ঘটলে ভালো, কিন্তু সাময়িকপত্রে বা কোনো আলোচনার বইতে তেমন কোনো স্খলন চোখে পড়লে মনে করা যায় যে পরে হয়তো শোধন সম্ভব হবে এর; আর তাছাড়া, নিছক খবর জানবারই জন্যে তো আর এর উপর নির্ভর করছে না কেউ। এসব লেখার মূল্য হয়তো অন্যত্র, হয়তো কোনো রসগ্রহণে, হয়তো নতুন কোনো ভাবনার সঞ্চারে, কোনো তত্ত্বে হয়তো। তাই আমরা তত ভাবিত হই না যখন প্রমথনাথ বিশীও 'রাজর্ষি'র জয়সিংহকে রাজসিংহ বলে ফেলেন হঠাৎ[১] বা অমিতাভ চৌধুরীর মতো তথ্যোৎসাহী মানুষও যখন বলেন,[২] 'রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হলো ১৮৮২ সালে। তার দুবছর পর ঠাকুরবাড়িতে অঘটন! কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করে মারা গেলেন'। কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করেন ১৮৮৪ সালের এপ্রিল মাসে। 'জীবনস্মৃতি'র পাঠকমাত্রেই জানেন যে তার মাস-চারেক আগে, ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বরে রবীন্দ্রনাথের বিয়ে। এ অবশ্য তেমন

কিছু ব্যাপার নয়, কিন্তু যে সুধীরঞ্জন দাস ছিলেন শান্তিনিকেতনের প্রথম আমলের ছাত্র, যাঁর শেষ কর্মজীবন কাটল শান্তিনিকেতনেরই দায়িত্ব নিয়ে, সেই সুধীরঞ্জন আমাদের জানিয়ে দেন যে রবীন্দ্রনাথের গদ্যনাট্যের একটি হলো 'রাজা ও রানী', তাঁর প্রতিভাময়ী বড়দির নাম স্বর্ণকুমারী আর স্বদেশী যুগে রবীন্দ্র-রচিত গানগুলির অন্যতম হলো 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই'।[৩] মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় ? রজনীকান্তের এই অতিখ্যাত গানটিও নিয়ে নেবেন রবীন্দ্রনাথ ? তাহলে মেরী কারোলিন ডেভিস নাম্নী কোনো মহিলা যদি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তাসো আর শেক্সপীয়রকে একসঙ্গে পেয়ে এইরকম বলেন তো দোষ নেই আর : 'তরুণ হিন্দু কবি ধন মুখার্জীর সাহায্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি নাটক অনুবাদ করবার ভাগ্য হয়েছিল আমার, নাটকটির নাম চিন্তামণি ও বিল্বমঙ্গল'।[৪] এর থেকেই যে রবীন্দ্ররচনার প্রতি তাঁর আগ্রহ বাড়ে, এই খবর জেনে আমাদের শরীর ঈষৎ বিষণ্ণ হয়ে আসে যদিও— কিন্তু তাহলেও বলতে হবে যে এ নিয়ে ভাবনা করার কিছু নেই, এ তো আর তথ্যের 'আকর গ্রন্থ' নয়। আমরা যে হামেশাই ভুল এড়াবার জন্যে বিশ্বকোষের দ্বারস্থ হই, এ তো আর তেমন কোনো কোষগ্রন্থ নয়। বিশ্বকোষে কি থাকতে পারত এমন সব খবর ?

তাহলে একবার দেখা যাক কোষবদ্ধ রবীন্দ্রনাথের ছবি। এটা ঠিক যে দ্বারকানাথের পৌত্র অভিভূতই হতেন, সেই ছবি যদি দেখতে পেতেন তিনি নিজে। তিনি জানতে পারতেন তাহলে যে তাঁর বাবার সঙ্গে অসংখ্যবার তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন ভারতীয় তীর্থগুলিতে,[৫] প্রথমে তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন প্রাচীন দুই বাঙালি কবি চৌন্ডিদাস আর বিদ্যাপতির অনুকরণে, আর তাঁর

প্রথম মৌলিক বই হলো 'ভানু সিংস' ।[৬]* বিদেশের পাঠকেরা যাতে বুঝতে পারেন এই দেশীয় শব্দবন্ধের মানে, সেজন্য 'ভানু সিংস'-এর পাশে বন্ধনীতে অবশ্য অনুবাদ দেওয়া আছে এর : Evening and Morning Songs ।[৬] সবাই অবশ্য মানেন না যে এটিই তাঁর প্রথম মৌলিক বই, খুব জোর দিয়েই একজন বলেছেন যে বেশ অল্প বয়সেই তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন এবং তাঁর প্রথম কবিতার বই হলো 'মানসী' বা 'Mind's Embodiment' ।[৭] রবীন্দ্রনাথ জানলে হয়তো খুশিই হতেন যে তিন হাজারের উপর গান লিখেছিলেন তিনি, লিখেছিলেন শিলাইদহে বসে তাঁর Gitanjali, The Crescent Moon বা The Gardener বইগুলিতে ।[৮] ওই একই উৎস থেকে আমরা জেনে মুগ্ধ হই যে ১৯১৯ সালে বেরিয়েছিল তাঁর Second Series of Gitanjali ।

গান তিনি কত লিখেছিলেন এ নিয়ে অবশ্য কোষে-কোষে লড়াই খুব বেশি । কেননা অন্য একটি সূত্রে[৯] জানছি যে এক-হাজারের কিছু বেশি কবিতা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তার মধ্যে অনেকগুলিতে সুর দিয়েছিলেন তিনি নিজেই । কারো-বা[১০] মত এই যে প্রায় তিনশোটি কবিতায় সুর দিয়েছেন তিনি । দু-একজন

* এই লেখা প্রেসে যাবার পর চোখে পড়ল 'এনসাইক্লোপীডিয়ায় রবীন্দ্রনাথ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন অমল হোম, আজ থেকে প্রায় পনেরো বছর আগে । চৌলিদাস আর ভানু সিংস-এর এই তথ্যটি সেই প্রবন্ধেও ব্যবহৃত । যে-বারোটি বিশ্বকোষ আমার এই আলোচনার ভিত্তি, তার মধ্যে তিনটি অমল হোমও দেখেছিলেন । আর, অন্য দুটি বইয়ের ইতিমধ্যে পালটে গেছে সংস্করণ, অর্থাৎ এক ভুলের বদলে সেখানে দেখা দিচ্ছে অন্য ভুল ।

এ কথা বলতে ভোলেননি যে ভারতের জাতীয় সংগীতের তিনিই প্রণেতা, তবে তার সুর রচনা করেছিলেন Herbert Murrill।[১১] একজন জানিয়েছেন ১৯১৬ থেকে শুরু করে মৃত্যুকাল পর্যন্ত একুশটি বই লিখেছেন কবি।[১২] পনেরোটি প্রবন্ধের বই, একশোটি কবিতার বই, পঞ্চাশটি নাটক আর চল্লিশটি উপন্যাস লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ, মনে করিয়ে দিয়েছেন আর-একজন।[১৩] অবশ্য তিনি এও জানিয়েছেন যে এর মধ্যে বেশির ভাগই বাংলায় লেখা। ইংরেজি ছাড়া 'native Bengali'-তেও যে দু-চারটি বই লিখেছেন তিনি ('also wrote in native Bengali') এ খবর আমরা অন্য সূত্রেও টের পাই।[১৪] একটি বই লিখেছিলেন তিনি Lover's Guest নামে,[১৫] বিলেত যান প্রথম ১৮৭৭ সালে,[১৬] আর ১৯১১ সালে ছাপা হলো তাঁর 'গল্পগুচ্ছ'।[১৭] কেউ বা জানান[১৮] তিনি পিতার সপ্তম এবং কনিষ্ঠ পুত্র, কেউ বলেন চতুর্দশ এবং কনিষ্ঠ।[১৯] স্যার উপাধি ছেড়েছিলেন কেন রবীন্দ্রনাথ? একেবারে অন্তিম বয়সে পশ্চিমের সভ্যতার রকমসকমে বীতশ্রদ্ধ হয়ে,[২০] অন্যমতে, পাঞ্জাবের দাঙ্গাবাজদের শায়েস্তা করবার জন্য ইংরেজ সৈন্যরা গুলি চালিয়েছিল বলে।[২১] একজন ভারতীয় লেখক অবশ্য এদের দাঙ্গাবাজ না বলে বলেছেন স্বাধীনতার জন্য বিক্ষোভকারীর দল।[২২] দাক্ষিণাত্যে তুকারামের স্তোত্র যেমন, রবীন্দ্রনাথের গানগুলিও তেমনি ঘুরে বেড়ায় বাংলাদেশের 'প্রতিটি কৃষকের ঠোঁটে', শুনেছেন একজন।[২৩] রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আরো যদি জানতে হয় তাহলে আরো কী কী বই পড়া যেতে পারে তার একটি সুবিধাজনক তালিকাও করে দিয়েছেন কেউ।[২৪] খুব অল্প দু-চারটি বইয়ের মধ্যে তিনি এই নামগুলিকেও জরুরি বলে ভাবেন

না, বিদেশীয় কোষ তাহলে আর খুলব না রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে। বিদেশের লেখকেরা যে দু-চারটে ভুল করে বসবেন, সে তো অসম্ভব নয় একেবারে। তবে কি আমরা নির্ভর করব দেশীয় কোষের উপর? যেমন ধরা যাক ভারতকোষ, যে-ভারতকোষের পঞ্চম খণ্ড বেরিয়েছে সম্প্রতি? হঠাৎ দ্রুত-প্রয়োজনে কারো দরকার হতেও পারে সে-বই খুলে দেখবার, কোনো একটি তথ্য মিলিয়ে নেবার জন্য হয়তো-বা। তাহলে তিনি কী কী জানতে পারবেন রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে ছোটো সেই লেখাটির থেকে?

জানতে পারবেন যে রবীন্দ্রনাথের সেজদার নাম ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ[২৫], জানতে পারবেন যে সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভা[২৬] নেমেছিলেন 'বাল্মীকিপ্রতিভা'য় সরস্বতী-ভূমিকায়। জানতে পারবেন, রবীন্দ্রনাথ হিন্দুমেলার 'দশম' বার্ষিক অধিবেশনে যে কবিতা আবৃত্তি করেন, তাঁর 'প্রথম স্বাক্ষরযুক্ত' সেই রচনা ছাপা হয় অমৃতবাজার পত্রিকায় ১৮৭৪ সালে।[২৭] এই কোষ অনুযায়ী 'ছিন্নপত্রাবলী' প্রকাশিত হয় ১৯১২ সালে[২৮], 'রক্তকরবী' লেখা হয় ১৯২৬-এ[২৮] আর 'মানুষের ধর্ম' বিষয়ে বক্তৃতা দেন তিনি ১৯৩২ সালে।[২৯] এখান থেকে আমরা জানি যে পূর্ব ও পশ্চিম জগৎ বিষয়ে প্রথম সমালোচনা প্রকাশ করেন তিনি 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি'তে।[৩০] 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' এখানে হয়ে যায় 'ভানুসিংহের পদাবলী', 'য়ুরোপযাত্রী কোনো বঙ্গীয় যুবকের পত্র' এখানে 'য়ুরোপপ্রবাসী কোনো বঙ্গীয় যুবকের পত্র'।[৩১] এখানে আমরা জানতে পাই যে কবির স্ত্রী এবং মধ্যমা কন্যার মৃত্যু ঘটে

'ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের জন্য'[৩২] এবং হিন্দু-মুসলমানের কলহ দেখেই তিনি লেখেন 'নটীর পূজা'।[৩৩] 'মানুষের ধর্ম' হলো তাঁর বিলেতের হিবার্ট বক্তৃতামালারই 'সারমর্ম'[৩৪] এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কাল ছিল ১৯০৩,[৩৫] —এ-সব তথ্যও আমরা জানতে পাই প্রসঙ্গক্রমে।

কে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে ভারতকোষে? অযোগ্য কেউ কি? রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে অনভিজ্ঞ কেউ? সে-কথা বলবার উপায় নেই কোনো। রবীন্দ্রজীবনীর যে-কোনো তথ্য বিষয়ে সব সময়েই যাঁর দুয়োরে যেতে হয় আমাদের, সেই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ই এর লেখক। এটা ঠিক যে অনুমাননির্ভরতা 'রবীন্দ্র-জীবনী'তেও কখনো কখনো আত্মপ্রকাশ করে বসে, এটা ঠিক যে কখনো কখনো তন্নিষ্ঠ তথ্যজ্ঞাপনের বাইরে এসে কাল্পনিক কার্য-কারণ-সূত্র ধরিয়ে দেবার চেষ্টা 'রবীন্দ্রজীবনী'তেও আছে, কিন্তু অমূল্য সেই চারখণ্ড জীবনীর ব্যাপক বিস্তারের মধ্যে তার একটা জায়গা হয়ে যায় হয়তো। সংক্ষিপ্ত এই তথ্যপরিসরেও তার প্রয়োগ কি ঠিক? প্রকাশকাল আর রচনাকালের ভিন্নতা বিষয়ে আরো একটু অবধান কি আশা করা যায় না এখানে? রচনা বা গ্রন্থের শিরোনামে গ্রন্থপঞ্জীকারের নির্মম তন্ময়তা কি আরো একটু ব্যবহার্য নয় কোষগ্রন্থে? আর সবচেয়ে বড়ো কথা, কোনো শিথিলতম মুহূর্তেও কি প্রভাতকুমারের মতো নিরলস গবেষকের কলম থেকে পৌঁছতে পারে এই সংবাদ যে সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা ছিলেন প্রতিভা? মুদ্রণপ্রমাদ? এর সবই কি গণ্য হবে মুদ্রণের প্রেত হিসেবে? কিন্তু কোন্ প্রেতের ছায়া এতদূর পর্যন্ত দীর্ঘ হয়ে পৌঁছতে পারে, তা আমাদের ধারণার অগম্য।

তখন মনে হয়, সমস্যাটা আসলে অন্যত্র। এই ভারতকোষ

পরিকল্পনার প্রথম এক পর্বে দেশের মাননীয় কোনো মনীষী ক্ষোভ করে বলেছিলেন যে এদেশে কোনো বিষয়েরই বিশেষজ্ঞ নেই কোনো, কোনো বিষয়েরই উৎসুক পাঠক নেই কোনো। কথা-দুটি যদি সত্যি হয় তো মানতে হবে যে এদেশে কোষগ্রন্থেরও প্রয়োজন নেই কোনো। কিন্তু না, কথা-দুটি ভুল। অন্তত, অত্যন্ত ভুল এই ধারণা যে এদেশে উৎসুক পাঠক নেই কোনো। আমরা যদি কেবল বড়ো-বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে চোখ না রাখি, যদি উচ্চাশী উত্থান-লোলুপ বুদ্ধিজীবীদেরই একমাত্র পাঠক বলে ভুল না করি, তাহলে জানতে পারব যে শহরের অলিতে গলিতে মফস্বলে গঞ্জে-বাজারে আজও আছেন এক-এক সশ্রদ্ধ একাকী উন্মুখ পাঠক, যাঁরা পরম নিষ্ঠায় আর আগ্রহে জানতে চান সহস্র বিষয়। তাঁদের উপেক্ষা করবার কোনো অধিকার আছে কি লেখকদের? তাঁদের কথা মনে থাকে না বলেই জ্ঞানী মানুষদেরও এমন বিপর্যয় হয়। জ্ঞানীরা তখন ভুলে যান যে তাঁদের যে-কোনো-বয়সে লেখা প্রতিটি রচনার প্রতিটি লাইন ছুটে যাচ্ছে সেই অজ্ঞাত নিরীহ জিজ্ঞাসু একাকী মানুষগুলির দিকে। আর ভুলে যান বলেই তার থেকে তৈরি হয় এমন এক মানসিক ক্লৈব্য, যার থেকে যে-কোনো-রকম অসম্ভব পরী-কল্পনা অনায়াসে চলে আসে কলমের মুখে তথ্য হিসেবে। ভুল করাটা ভয়ের নয়, ভুল আমরা সকলেই করি, কিন্তু যে-ভুলের জন্ম পাঠকের প্রতি নিদারুণ ঔদাসীন্য আর উপেক্ষা থেকে, প্রতিষ্ঠাব শিখরে থেকে অনায়াস অবহেলার যে ভুল, তার চেয়ে ভয়ংকর আর কিছু নেই।

উর্বশীর হাসি

ধরা যাক, হাতের সামনে হঠাৎ আমরা পেয়ে গেলাম প্রস্তুত এক তালিকা, যেখানে সাজানো থাকবে রবীন্দ্ররচনায় ব্যবহৃত যাবতীয় ব্যক্তি আর বিষয়ের নাম, পুঁথি বা চরিত্রের প্রসঙ্গ। কতই-না সুখের হতো তাহলে। উৎসুক একজন জানতে চাইলেন সেদিন, রবীন্দ্রনাথ কি কোথাও বলেছেন ফ্লবেয়ার বা চেকভের কথা? ধরা যাক, এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজবার জন্য গোটা রচনাবলীর উথালপাথাল আলোড়নের আর দরকার হবে না কোনো, বর্ণানুক্রমিক সেই তালিকায় সহজেই খুঁজে নিতে পারব সেটি, না অথবা হ্যাঁ দুয়েরই নির্দেশ মিলবে দ্রুত। ধরা যাক এরকম কোনো তালিকায় চরিত্রনাম হিসেবে বজ্রসেন বা উপগুপ্ত থেকে শুরু করে উর্বশী-মেনকা-রম্ভাদেরও দেখা পাওয়া গেল কোথাও। কোন্-কোন্ বই থেকে রবীন্দ্রনাথ কোন্ উদ্ধৃতির ব্যবহার করেছিলেন, পাওয়া গেল তারও হিসেব, পাওয়া গেল তাঁর সমস্ত প্রবন্ধ কবিতা গানের একটি নির্ভরযোগ্য তালিকা!

কিন্তু এত কল্পনারই-বা কী দরকার? নেই কি কোথাও এ-রকম? বিশ্বভারতীর রচনাবলী হাতের কাছে থাকে বলে আমার মতো অনেকে হয়তো ভালো করে লক্ষ করেননি সরকারী রচনাবলী, লক্ষ করলে তাঁরা দেখতে পাবেন যে এর পঞ্চদশ খণ্ডের নির্দেশিকায় সাজানো আছে এই সবটাই; নতুন উদ্যমে এ রচনাবলী ছাপা হচ্ছে আবার, সেইটে জানতে পেরে খুলতে হয়েছিল এই খণ্ড। ভাবতে

হয়েছিল, আমরা কি এর চেয়ে ভিন্ন কিছু চাই এবার, এর কোনো সম্ভাব্য উন্নতির পরামর্শ আছে কি কোনো পাঠকের মনে? এখানে এমন-কিছু কি আছে যার বদল বা বর্জন দরকার, অথবা সংযোজন? নিজের চাওয়াটাকে ঠিকমতো সাজিয়ে নিতে পারলে, বুঝিয়ে দিতে জানলে, পরে আর কোনো অশোভন সমালোচনা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় না নিশ্চয়।

ভাবনা যখন এই পর্যন্ত এগিয়েছে শুধু, চোখের সামনে খোলা আছে কেবল অন্তিম খণ্ডের নির্দেশিকা, চম্‌কে উঠল মন। ঠিক দেখছি কি? পাতার পর পাতা উলটে এখানে চোখে পড়তে লাগল এমন-সব নির্দেশ, এমন-সব সংবাদ, এমন-সব মুদ্রণ, যা বিশ্বাস-যোগ্য নয় একেবারে। এই খণ্ডটি ছাপা হয়েছে ঠিক বারো বছর আগে। এমন কি হতে পারে যে বারো বছর ধরে বহু মানুষ বহু যত্নে রেখে দিয়েছেন এই বই, এই তথ্যাবলী, নিজের নিজের সংগ্রহে, প্রতিবাদহীন? একটা সুবিধে অবশ্য এই যে অল্প লোকেরই কাজে লাগে এটা। কিন্তু সত্যিই দরকার হবে যাঁর? তাঁর হয়তো মনে হবে কোনো অফুরান হাসির গল্পের উৎস খুলে গেছে এখানে, আর অল্প পরেই অবসাদে ভরে যাবে মন। ভাগ্য নিয়ে বিলাপ করবার ইচ্ছে হবে তাঁর আরো একবার।

এখন, এই বারো বছর পর, এই বিলাপের হয়তো কোনো মানে নেই আর। কিন্তু অন্য দিক থেকে ভাবতে গেলে, হয়তো-বা এখনই এ-বিলাপের যোগ্য সময়। কেননা সমবেত দায়িত্বে একটা কাজ যখন হতে থাকে, কী ধরনের ভুল তখন সম্ভব সেটা বুঝে নেওয়াও দরকার। কী আমরা চাই, সে-বিষয়ে স্পষ্ট কোনো ধারণা যদি না-ও থাকে, নতুন রচনাবলীর সম্পাদকদের কাছে আমরা

জানিয়ে রাখতে পারি, কী আমরা চাই না। সম্পাদকদের মনোনিবেশ ঈষৎ স্খলিত হয়ে এলেই কী ধরনের তাণ্ডব তৈরি হতে পারে, তার একটা হিসেব কোথাও থেকে যাওয়া ভালো।

২

সূচী এখানে আছে অনেক রকমের। আছে কবিতানামের সূচী, প্রবন্ধনামের সূচী, গল্পনামের সূচী; সূচী আছে কবিতার প্রথম লাইন নিয়ে, গানের প্রথম লাইন নিয়ে। খণ্ডানুযায়ী, বর্ণানুযায়ী এবং কালানুযায়ী গ্রন্থনামের তিনটি ভিন্ন তালিকাও পাওয়া যাবে এখানে। আর সব-শেষে আছে বিবৃত এক উল্লেখপঞ্জী: 'রবীন্দ্র-রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ও বিষয়ের সূচী।'

উল্লেখপঞ্জী? এমন একটি উচ্চাশী এবং দিশারী কাজ এখানে আছে জেনে প্রথমে উচ্ছ্বাস জাগে মনে। এ ধরনের পঞ্জীর অভাবেই তো কত সময় অন্ধকার হাতড়ে বেড়াই আমরা। 'উল্লেখযোগ্য' শব্দটিতে অবশ্য একটা বিপদের সংকেত থেকে গেল, পাদটীকায় যে বলা হয়েছে 'অপ্রধান উল্লেখগুলি এ সূচীতে ধরা হয়নি' তার থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে সে বিপদ। প্রধান-অপ্রধানের বিচার হবে কেমন করে? কে করবেন বিচার? কখন কার পক্ষে উল্লেখযোগ্য, আর কখন-বা কার পক্ষে নয়, তার কোনো স্থিরতা কি থাকে? এ ধরনের সূচীর তাই একটা রীতিই হলো এমন-কোনো বাছাইয়ের ঝুঁকি না নেওয়া। তা না হলে যে অসংগতি তৈরি হতে পারে, এ উল্লেখপঞ্জী খুললেই সেটা চোখে পড়বে।

কিন্তু তার চেয়ে বেশি চোখে পড়বে এই যে, কোনোরকম সংকলন-নীতিই কাজ করছে না এই সংগ্রহের পিছনে। এ তালিকায়

A. E., শীলি কিংবা পাস্কালের নাম পাওয়া যাবে, কিন্তু মিলবে না পোপ ড্রাইডেন কিপলিং-এর খবর, ইবসেন বা ফ্লবেয়্যার তো দূরের কথা। এ নামগুলি কি অপ্রধান তবে? এটা কি ধরে নিতে হবে যে রবীন্দ্ররচনায় ব্রাউনিঙের নাম নেই কোথাও, আছে কেবল শ্রীমতী ব্রাউনিঙের নাম? এইটে কি বিশ্বাস করতে হবে যে কীটসের কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন সমস্ত জীবনে মাত্র একবার, দশম খণ্ডের ৯৪২ পৃষ্ঠায়? ছু'বার শেক্সপীয়র? 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' ছাড়া আর কোনো শেক্সপীয়রীয় নাটকের নামই বলেননি তিনি? রবীন্দ্ররচনায় কোথাও নেই 'ওথেলো,' 'কিং লীয়র', 'ম্যাকবেথ' বা 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট'-এর কথা? একাদশ খণ্ডে ওয়ার্ডসওয়ার্থের মিলটন-আবাহন ছাড়া অন্য কোনো দেখা নেই ওই কবির? না, এই পঞ্জীর নজিরে, আর-একবার অন্তত পাচ্ছি 'বার্নস ওয়ার্ডসওয়ার্থ কোলরিজ শেলী কীটস'-এর সমবেত উদ্ধার: ১৪/৩৪১। এই তাহলে কীটসেরও দ্বিতীয় নামোল্লেখ! কিন্তু পাখির চোখে দেখে গেলেও কী করে কারো নজর এড়িয়ে যায় যে কেবল 'সাহিত্যের পথে' বইটিতেই কতবার ফিরে ফিরে আসেন রবীন্দ্রনাথের প্রিয় এই তরুণ কবিটি।

এই পঞ্জী থেকে আমরা টের পাই যে বুদ্ধ খৃষ্ট মহম্মদেরও নাম করেছিলেন কবি একবার। একবার নাকি আছে 'বৈষ্ণব কবিতার উদ্ধৃতি', এমন-কী 'উপনিষদের শ্লোক উদ্ধৃতি'ও আছে একবার। অবশ্য, উপনিষদ একবার হলেও, ভিন্ন একটি উল্লেখে বলা হচ্ছে যে ঈশোপনিষদের শ্লোক আছে ছ'বার। শ্রীমতী পম্পা মজুমদার তাঁর শ্রমসাধ্য গবেষণায় কেবল 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্' শ্লোকটিরই যে উন-পঞ্চাশটি প্রয়োগ দেখিয়েছিলেন, সেটা তবে কোনো কাজে লাগল

না আর। গোটা 'ছিন্নপত্রাবলী' এই রচনাবলীতে ছাপা থাকলেও ইন্দিরাদেবীর কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি খুঁজতে হবে কেবল দশম খণ্ডের ৪৭৩-৭৪ পৃষ্ঠায়। 'য়ুরোপীয় গান ও ভারতীয় গানে'র উল্লেখের জন্য খুলুন শুধু চতুর্দশ খণ্ডের ৮৯৩ পৃষ্ঠা। ইংরেজ শাসন (১৪/৮০) ইংরেজি ভাষা (১৪/৮০) বা পাশ্চাত্য সমাজ (১০/৯৩৫) কথাগুলিও নাকি একবার করে পাওয়া যায় তাঁর লেখায়, একবার করে পাওয়া যায় মহাভারত (১৫/২৫) বা রামায়ণেরও (১১/৫৯৮-৯৯) নাম। ঘটকর্পরের নাম অবশ্য বলেছেন একবার রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু বলেননি কখনো ভারতচন্দ্রের কথা। 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধটি ছাড়া আর কোথাও নাকি নেই চণ্ডীদাসের কোনো উল্লেখ।

বিষয়ের সূচী বলতে সত্যি যে কী বোঝায়, এই সূচী থেকে তা আবিষ্কার করা একটু শক্তই হতে পারে। এইসব অত্যাশ্চর্য 'বিষয়' আমরা পেয়ে যাব সংকলয়িতাদের হাত থেকে : চোখের উপর হইতে পর্দা সরিয়া গেল, আশ্রমের আকাশে শারদোৎসব, আত্মরক্ষার শক্তি অর্জনে জাপানের দৃষ্টান্ত, Evening Party-তে, গল্পগুচ্ছ বুর্জোয়া লেখকের সংসর্গদোষে অসাহিত্য, চীনসভ্যতায় ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ নেই, দেশ মানুষের সৃষ্টি, প্রত্যাবর্তন (বিলাত থেকে), বিজয়াকে গ্রন্থ উৎসর্গ, বোলপুরের মাঠের এই ভূখণ্ড, Violet Indigo Blue Green Yellow Orange Red এবং এইরকম আরো অনেক কিছু। এই জেনে আমরা চমৎকৃত হই যে রবীন্দ্র-রচনাবলীতে দুটি 'ঘটনা'রও উল্লেখ আছে : 'ঘটনা (এক বিদেশী পীড়িত হয়ে পড়েছিল)', 'ঘটনা (চাষির ছেলেকে চাকরি দেবার অনুরোধ)'। ঘটনাই বটে। কিন্তু ঠিক এই পর্যায়ে বিষয়ের সূচী করতে গেলে যে তার পরিমাণও গোটা রচনাবলীরই সমান হবে

প্রায়, এ-কথা বোধহয় ভেবে নেননি এঁরা। ফলে যে-কোনো রচনার যে-কোনো শব্দগুচ্ছ হঠাৎ-হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে আসে পঞ্জীতে, কেন সেগুলি আসে অথবা তার তুল্য অন্য উল্লেখগুলি কেনই-বা আসে না, এ নিয়ে কোনো দুর্ভাবনা নেই। 'তপতী' নাটকের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ 'রাজা ও রানী' বিষয়ে একটি মন্তব্য করে-ছিলেন : সেই আমার প্রথম নাটক লেখার চেষ্টা। অতএব 'নাটক লেখার প্রথম চেষ্টা' নামে একটি বিষয় পাওয়া গেল। কিন্তু পঞ্জীর দিক থেকে তার চেয়ে অনেক জরুরি কয়েকটি নামোল্লেখ যে আছে ও-পৃষ্ঠাতেই (রাজা ও রানী, শকুন্তলা, কালিদাস, মেঘদূত, গগনেন্দ্র-নাথ), তার কোনো হদিস পাওয়া যাবে না আমাদের এই সূচী থেকে। এখানে হঠাৎ আমরা চিন্তিত হয়ে পড়ব 'কবিতা' শব্দটি নিয়ে, যার দেখা পাওয়া যাবে নাকি চতুর্দশ খণ্ডের ৫০৯-১২ পৃষ্ঠায়। কী ব্যাপার হতে পারে সেটা? খণ্ডটি খুললে তবে টের পাব যে ঐ পৃষ্ঠাগুলি জুড়ে আছে 'সাহিত্যের স্বরূপ' নামের প্রবন্ধ, যার প্রথম শব্দটি হলো 'কবিতা'। দশম খণ্ডের ৬১১-১৩ পৃষ্ঠায় আছে নাকি 'ক্রন্দসী'। তিন পৃষ্ঠা জুড়ে ক্রন্দসী? মানে? মানে হলো, 'জাভা-যাত্রীর পত্র'র দুটি সংখ্যায় অন্তরীক্ষের বর্ণনা করেছিলেন কবি, শুনেছিলেন সত্তার ক্রন্দন, শব্দটি তাই এসেছিল দু'বার। তখন মনে হয়, কেবল শব্দ নয়, যেন নিষ্কাশিত ভাবেরও একটি সূত্র দেবার জন্য প্রস্তুত এই তালিকা, যেন পরীক্ষার প্রেসি লিখবারও আয়োজন তৈরি হয়ে আছে এখানে। 'সাহিত্যের পথে' বইটির 'সৃষ্টি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে ব্যাখ্যা করে পাওয়া যায় না সাহিত্যের মর্ম, পেতে হয় তাকে প্রত্যক্ষ আস্বাদনের মধ্য দিয়ে। অনিবার্য অলংকার হিসেবে তখন চলে এসেছিল তপোভঙ্গের ছবি, মেনকা-

উর্বশীর অখণ্ড সুরপ্রতিমার ছবি। লিখেছিলেন: ‘উর্বশীর ওষ্ঠপ্রান্তে যে হাসিটুকু লেগে আছে তার দিকে চেয়ে দেখো, স্বর্গের সহজ সুরটুকুর স্বাদ পাবে।’ একেই ছেঁকে নিয়ে উঠে এল এই সূচীর সর্বোত্তম আকর্ষণ, মেদুর এবং রহস্যময়, মোনালিসার মতোই, ‘উর্বশীর হাসি’।

৩

রবীন্দ্রনাথের ব্যবহার করা বিষয় আর ব্যক্তির নাম যে মাত্র ষোলো পৃষ্ঠার মধ্যে ধরে দেওয়া যায় না, এটা বুঝতেই পারি। স্খলিত, অপূর্ণ আর দিশেহারা এই তালিকা থেকে অল্প সময়েই তাই চোখ সরিয়ে নেওয়া যায়, ভাবা যায় যে কঠিন কাজের যা বাস্তব বিপদ তা ঘটেছে এখানে। কিন্তু যেসব তালিকা এর চেয়ে অনেক কম শ্রম আর কম বিবেচনাতেও সাধ্য হতে পারে, অনেক সহজ আর অনেক যান্ত্রিক যা, সেখানেও কেন এ নির্দেশিকা বারে বারেই প্রতিহত আর প্রবঞ্চিত করবে আমাদের, সেটা ভালো বুঝতে পারি না। কতটাই উদ্‌ভ্রান্ত চালে সাজানো আছে—ধরা যাক—এর কবিতা-নামের সূচী, যে-কোনো টুকরো অংশ তুলে এনে একটু পরীক্ষা করা যাক তার। এই খণ্ডের ৩৯৫ পৃষ্ঠায় পাচ্ছি এইরকম কিছু নির্দেশ:

কবিতার নাম	গ্রন্থ	প্রথম পঙ্‌ক্তি	খণ্ড/পৃষ্ঠা
আধুনিক কাব্য	ছন্দ	রিচার্ড কোডি যখন শহরে [অনুবাদ : চীনে]	১৪/৩৪৯
”	সাহিত্যের পথে	এঘরে ওঘরে যাবার [অনুবাদ : [Eliot]	১৪/৩৪৬
”	সাহিত্যের পথে	তুমি সুন্দরী এবং তুমি [অনুবাদ]	১৪/৩৪৪

ব্র্যাকেট প্রয়োগের ভঙ্গি থেকে শুরু করে কবিতানামের এই বিবরণ আক্ষরিকই ছাপা হলো এখানে। কবিতার নাম 'আধুনিক কাব্য'? সে কী রকম কাণ্ড? ঠাট্টা করে যদি কেউ না বলেন যে কবির রচনামাত্রেই কবিতা, তাহলে এখানে পাঠকদের ঈষৎ বিচলিত হবার অধিকার আছে। গ্রন্থনাম থেকে বোঝা গেল যে, কবিতা নয়, প্রবন্ধেরই কথা বলা হচ্ছে নিশ্চয়। কিন্তু 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধটি 'ছন্দ' বইতে? খণ্ড/পৃষ্ঠা-সংখ্যা থেকে বোঝা গেল যে ওটা বোধ হয় ছাপারই ভুল, 'সাহিত্যের পথে' ছাপাই নিশ্চয় অভিপ্রেত ছিল। কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তি 'রিচার্ড কোডি' যদিও 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধের সূচনা-শব্দ নয়, তবু এই পর্যন্ত এসে ভুলের কারণটা ধরা গেল। ওই প্রবন্ধে কোন্ কোন্ কবিতার প্রয়োগ আছে, সেটাই নিশ্চয় জানাতে চান সংকলয়িতা। পদ্ধতিটি যথেষ্ট সুখকর কিনা সে-ভাবনাতে পৌঁছতে-না-পৌঁছতেই আমরা মূর্ছিত হয়ে পড়ি এই সংবাদে যে 'রিচার্ড কোডি যখন শহরে যেতেন' লেখাটি নাকি এক চীনে কবিতার অনুবাদ! এডুইন আর্লিংটন রবিনসনের নাম অবশ্য মূল প্রবন্ধটিতে নেই, কিন্তু তেমনি, 'চীনে কবিতা' বলেও রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেননি এই মার্কিনী কবিতাকে, লেখাটি পড়ে তা টের পেতেও বিস্তর অসুবিধে হবার কথা নয়। অন্যপক্ষে, 'তুমি সুন্দরী এবং তুমি বাসি' যে এমি লোয়েলের কবিতা থেকে অনুবাদ, প্রবন্ধে তার স্পষ্ট উচ্চারণ থাকলেও এ-তালিকায় আমরা পাব না ওই নাম; ঠিক ওপরেই এলিয়টের নাম—হঠাৎ রোমান হরফে—বলা আছে যদিও।

'কবিতার নামের বর্ণানুক্রমিক সূচী' থেকে এই তিনটি লাইন আমি তুলে নিয়েছি একই সঙ্গে নানা ভুলের বৈচিত্র্য দেখাবার

জন্যে। তা নইলে, এ তালিকার প্রায় সর্বত্রই ছড়ানো আছে এমন সব আশ্চর্য খবর যে রবীন্দ্রনাথের কবিতানাম হিসেবে আমাদের আজ জানতে হয় : কবির অভিভাষণ, চিরকুমার সভা, ছন্দের অর্থ, ছন্দের মাত্রা, ছন্দের হসন্ত-হলন্ত, জাভা-যাত্রীর পত্র, পত্রধারা প্রথম পর্যায়, বাংলাভাষা পরিচয় আর এই রকমেরই আরো অনেক নাম। আর এর ফলে, স্বভাবতই, কবিতার বই হিসেবে এখানে ছুটে আসে জাপানযাত্রী, আলোচনা, পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, খৃষ্ট, সংযোজন, সে বা শেষের কবিতা!

এ বিপর্যয় কেন ঘটছে তার একটা কারণ অবশ্য বোঝা যায়। অনেক সময়েই লেখকেরা তাঁদের আলোচনার সুবিধের জন্য উদাহরণ তুলে আনেন, উদ্ধৃত করেন হয়তো নানা ধরনের কাব্য-পঙ্ক্তি। রবীন্দ্রনাথ এরকম অবস্থায় নিজেও তৈরি করে নিতেন অনেক লাইন, অথবা হয়তো করে নিতেন দু-চার ছত্রের অনুবাদ। কিন্তু কবিতানামের বা কবিতাপঙ্ক্তির সূচীতে যে এদের জায়গা চাই, এই ধারণা কি ঠিক? 'পাৎলা করি কাটো প্রিয়ে কাৎলা মাছটিরে' 'চকমকি ঠোকাঠুকি আগুনের প্রায়' অথবা 'কই পালঙ্ক কই রে কম্বল'-এর মতো কথাগুলি যে টুকটাক বানাতে হয়েছে ছন্দ আলোচনার জন্যে, তাকেও কি বলতে হবে কবিতা? কবিতা শব্দটির ওপর একটু বেশি কি জুলুম হয়ে যায় না তবে? যদি তেমন জুলুম করতেও চান কেউ তো প্রবন্ধে প্রযুক্ত পদ্যপঙ্ক্তির একটি ভিন্ন সূচীর কথা ভেবে নেওয়াই কি সংগত নয়? কোনো-কোনো বোধবিপর্যয় হয়তো রোধ করা সম্ভব হতো তাহলে। তার অভাবে, 'বারি ঝরে ঝরঝর নদীয়ায় বান' বা 'মন্দ মন্দ বৃষ্টি পড়ে নবদ্বীপে বান'-কেও রবীন্দ্রনাথের কবিতা বলে জানতে হয় আমাদের, কাব্য-

পঙ্‌ক্তির তালিকায় পেতে হয় 'সাহিত্যের স্বরূপ' বই থেকে 'তোমার ঐ মাথার চূড়ায় যে রঙ আছে উজ্জ্বলি' অথবা 'সাহিত্যের পথে'র 'বিধি হে যত তাপ মোর দিকে'র মতো নিছক অনূদিত লাইনগুলি।

গানের সূচীতে পাব এমন অনেক লাইন যা 'গীতাঞ্জলি'র না হলেও মনে হবে যেন 'গীতাঞ্জলি'র ; 'এখনো ঘোর ভাঙে না তোর', 'কোলাহল তো বারণ হলো' বা 'পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহো' যেমন।[১] ছোটোগল্পের তালিকায় এখানে পাওয়া যাবে 'লিপিকা'র সন্ধ্যা ও প্রভাত, সতেরো বছর, প্রথম শোক, কৃতঘ্ন শোক বা পায়ে চলার পথের মতো লেখা, বৃথাই রবীন্দ্রনাথ এদের কবিতা বলে গণ্য করতে চেয়েছিলেন একদিন। এগুলি গল্প ; কিন্তু 'ব্যঙ্গকৌতুক' বইটির রসিকতার ফলাফল, সারবান্ সাহিত্য বা প্রাচীন দেবতার নতুন বিপদ-এর মতো লেখাগুলি যদি পেতে চান তো খুঁজতে হবে প্রবন্ধেরই তালিকা। সে তালিকায়, সেই প্রবন্ধ-সূচীতে, অবশ্য আরো আছে জনগণমনঅধিনায়ক অথবা ছিন্নপত্র অথবা চিঠিপত্র। ছন্দধাঁধা বা ছন্দোহার নামেও কি রবীন্দ্রনাথ

১ ঘটনাটা এই যে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত সূচীকেই এখানে কাজে লাগানো হয়েছে, কিন্তু লক্ষ্যে আনা হয় নি তার ব্যবহারনির্দেশ। গানের প্রথম পঙ্‌ক্তি মাত্র বলা থাকলেও 'গীতবিতান' বইতে তার সঙ্গেই আছে স্বরলিপির উল্লেখ। এই উল্লেখে বিশ্বভারতী কয়েকটি সংক্ষেপীকরণের সাহায্য নেন, যেমন 'সংগীতগীতাঞ্জলি'কে সংক্ষেপে বলা হবে গীতাঞ্জলি। সরকারী সংস্করণে এই তথ্যটির অবলোপে পাঠকেরা ধাঁধায় পড়েন। পরিচিত 'গীতাঞ্জলি' নামটি কেন বারবার ফিরে আসছে, তাঁরা বুঝতে পারেন না ঠিক।

প্রবন্ধ লিখেছিলেন কথনো, কিংবা ধরা যাক 'দিলীপকুমার রায়কে' নামে কোনো প্রবন্ধ ? অন্তত‌পক্ষে, এই শেষটিও বললে একটু কি বাড়াবাড়ি হয় না ?

নিছক গ্রন্থনামের সহজ পঞ্জীতে পৌঁছেও যে স্বস্তি পাব, এমনও নয়। কীভাবে রবীন্দ্রনাথের বইয়ের নাম হতে পারে 'বিদেশী ফুলের গুচ্ছ' বা 'অবিস্মরণীয়', 'ম্যাকবেথ নাটকের অংশ' অথবা 'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য' ? এসব নামের বই কি ছাপা হয়েছে কখনো ? অন্যপক্ষে, কেন এ তালিকায় খুঁজে পাব না বাল্মীকি-প্রতিভা, মায়ার খেলা, শ্যামা বা নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা-চণ্ডালিকার মতো বইগুলির নাম ; কেনই বা 'পথে ও পথের প্রান্তে' থাকবে বিশ্বযাত্রী-বিভাগে আর 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'র জায়গা হবে পত্রাবলীতেই,[২] কেন 'প্রাক্তনী' চলে যাবে শিক্ষা ছেড়ে বিবিধ প্রসঙ্গে ; এসব তত্ত্ব বোঝা সহজ নয়। হঠাৎ কেন 'কালান্তর' বইটির তিনটি সংস্করণের বিবরণ জড়ো হয় এখানে, তার চেয়ে সংস্করণ হিসেবে অনেক ব্যাপকভাবে ভিন্ন 'গীতবিতান'-এর হিসেব কেন থাকে না তবে, বর্ণানুক্রমিক গ্রন্থতালিকায় একাধিক বইয়ের প্রকাশ-তারিখ কেন লুপ্ত হয়ে যায়, কেন-বা একই বইয়ের নাম কখনো 'সংগীত' কখনো 'সংগীতচিন্তা', কালানুক্রমিক তালিকায় কেন পাব না 'শেষের কবিতা'র মতো কোনো-কোনো বইয়ের নাম, ১৩১৬ সালেই 'শান্তিনিকেতন' বইটির নাম কেন বলা হবে দু'বার,

২ আগেরটিতে কিছু ভ্রমণ-প্রসঙ্গ আছে বলে বিশ্বযাত্রী ? পরেরটিতেও তো পাব তবে কলকাতা শিলং মাদ্রাজ বোম্বাই কলম্বোর ঘূর্ণন, কেবলই শান্তিনিকেতন তো নয়।

'ঘরে বাইরে'র অনেক পরে কেন বিন্যস্ত হবে 'চতুরঙ্গ' আর কেবল-মাত্র বাংলা রচনাবলীর এই তালিকায় সহসা কেন Mahatmaji and Depressed Humanity-র উল্লেখ করতে হলো, যেন ওই একটিই ইংরেজি লেখা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এরও কোনো উত্তর নেই। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন বটে একবার: 'চিরপ্রশ্নের বেদী-সম্মুখে চিরনির্বাক রহে/বিরাট নিরুত্তর।'

আর, মুদ্রণের অসংখ্য ভুল নিয়ে অবশ্য বিলাপ করবারও মানে নেই কোনো। ওটা হয়তো আজও আমাদের মেনেই নিতে হবে এ দেশে। তবু মনে হয়, অসিতা (অমিতা) সেনের পরিণয় বা আলাতোল (আনাতোল) ফ্রাঁস বা Anna Karanina (Karenina) হয়তো সয়ে যাবে একরকম, কিন্তু চীনা কবি লিপো যখন এই নির্দেশিকায় হয়ে যান চীনা কবি থি-প্লে, 'রথীরে কহিল গৃহী' যখন হয় 'রক্ষীরে কহিল গৃহী' (পৃ. ৪৪৪) বা ম্যাথু আর্নল্ডের 'জুবেয়ার' যখন হয়ে দাঁড়ান 'পুবেরায়', তখনো কি আমরা কেবল সুধীন্দ্রনাথের এই লাইন উদ্‌ধৃত করে বলব যে এতে 'বিষাদই শুধু আছে/তাছাড়া কোনো যাতনা জ্বালা নাই'?

৪

বিভ্রাটের এ অবশ্য কোনো সম্পূর্ণ বিবরণ নয়, এ হলো সামান্য কয়েকটি ইশারা মাত্র। কিন্তু ভাববার বিষয় কেবল এই যে, কেন থেকে-থেকেই এ ধরনের বিভ্রাটে জড়িয়ে পড়ব আমরা, কেন দিনে-দিনেই নেমে যাবে আমাদের সমস্ত কাজের মান। তার একটি কারণ কি এই যে অনেকের সমবায়ে কাজ করতে আমরা অনভ্যস্ত আজ? কারণ কি এই যে এদেশে যোগই অনেক সময়ে হয়ে দাঁড়ায়

বিয়োগের তুল্য ? একজনের সঙ্গে আরেকজনের উদ্যম মিলে গেলে যখন দ্বিগুণ ভরসা পাবার কথা, তখন দেখি এক আর এক মিলে একই থেকে যায় অথবা হয়ে যায় শূন্য। কারণ, আমাদের সমবেত কাজের একটা অসুবিধে এই যে সকলেই ভাবেন এটা অন্যের দায়িত্ব, কোনো কেন্দ্রীয় বীক্ষণ বা সংহতি হয়তো বেঁচে থাকে না শেষ পর্যন্ত।

রচনাবলীর ওই সংস্করণের সম্পাদনা করেছিলেন যাঁরা, এ বিষয়ে নিশ্চয় তাঁরা অনধিকারী ছিলেন না। বিশেষ-এই নির্দেশিকা খণ্ডটির কাজে লেগেছিলেন আরো যে আঠারো জন গবেষক, তাঁরাও হয়তো অযোগ্য নন তত। তবুও কেন এমন ভয়ংকর চেহারা নেয় এই বই ? কেন এত রহস্যময় হয়ে ওঠে এর প্রয়োগপদ্ধতি ? তখনই মনে হয় আমাদের সমবায়শক্তির দীনতার কথা, কাজ থেকে ভালো-বাসা লুপ্ত হবার কথা, বিষয় থেকে ব্যক্তিরই প্রধান হয়ে উঠবার কথা। এমন-একটি কাজের প্রতিটি স্তরেই যদি-না আমরা সতর্ক রাখি আমাদের সমস্ত ক্ষমতা উদ্যম আর ভালোবাসা, যদি-না আমরা গভীর এবং সত্য কোনো দায় বোধ করি দেশ আর রবীন্দ্রনাথের প্রতি, যদি-না মনে থাকে যে এ কাজ কোনো ব্যক্তিগত সোপান-চিহ্ন নয়, তাহলে বারেবারেই ফিরে আসবে এইসব প্রলাপকীর্তনের হট্টরোল, নিয়তির হাসিকে তখন অগত্যা আমাদের ভেবে নিতে হবে উর্বশীর হাসি, আর ব্যবহারহীন কোনো দূরের ফ্রেমে তাকে সাজিয়ে রাখতে হবে কেবল দিনের পর দিন।

কবে কোন্ গান : ১

কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শুনেছি তাঁর ছাত্রদের জানিয়েছিলেন কী ভাবে রবীন্দ্রনাথ একটি গানের মধ্যে মিলিয়ে নিয়েছেন বিদেশিনী এক নারীর সুষমা। সকলেই সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারবেন যে 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী' গানটির উল্লেখ করছেন অধ্যাপক, ভাবছেন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর কথা। প্রথমে শুনে মনে হয় এ তো হতেই পারে, ভুবনভ্রমণের শেষে রবীন্দ্রনাথ সিন্ধুপারের এক নূতন দেশে তো পৌঁছেছিলেন ঠিকই, আর সেখানে এক বিদেশিনীর মধ্যে সত্যি তো তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন আশ্রয়। এ তো হতেই পারে যে দেখাশোনার সেই অভিঘাত থেকে উৎসারিত হলো তাঁর এই স্মরণীয় রচনা।

কিন্তু যদি জানা থাকে যে এটি লেখা হয়েছিল ওকাম্পোর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখা হবার প্রায় তিরিশ বছর আগে, তাহলে এ-রকম একটা কপোল-কল্পনা হঠাৎ একেবারে অলীক হয়ে পড়ে। এই বিশেষ গানটিকে নিয়ে এ-ধরনের ভুল হবার অবশ্য কোনো কারণ ছিল না, কেননা অনেকেরই মনে পড়বে যে 'জীবনস্মৃতি'তেই গানটির সবিস্তার উল্লেখ আছে। তবে এমন কখনো ঘটতেও পারে যে সুলভ কোনো তথ্যের অভাবে কোনো-একটি রচনা বিষয়ে কিছু ভুল বা অস্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়ে যায় কারো, ভুল প্রসঙ্গে জড়িত হয়ে যায় কোনো একটি গান বা কবিতা। যদি রবীন্দ্রনাথের গান-

গুলির নিশ্চিত রচনাকাল[১] জানা থাকত আমাদের, যদি জানা থাকত কোন্ পরিবেশে কী ভাবে গড়ে উঠছিল তাঁর কোনো লেখা, তাহলে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের মতো অভিজ্ঞ লেখককেও তাঁর 'বিজয়া'-কথায় অনিশ্চয় নিয়ে বলতে হতো না 'সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে···তিনি কার কথা ভেবে লিখেছিলেন ? কে জানে ?' কেউ কেউ নিশ্চয় জানেন যে গানটি লিখেছিলেন তিনি মাদ্রাজের সমুদ্র-কূলবর্তী প্রকৃতিবিস্তার দেখে, ১৯৩০ সালে তাঁর বিদেশযাত্রার আগের মুহূর্তে।

কী করে জানা যায় এসব ? জানবাব কোনো সহজ উপায় আছে কি ? গান শুনতে শুনতে কারো মনে যদি জেগে ওঠে এই প্রশ্ন, কোন্ হারানোর বেদনায় লিখতে হলো তাঁকে 'আমার ক্ষুদ্র হারাধনগুলি রবে না কি তব পা-য়', কখন তাঁর মনে হয়েছিল 'এবার আমায় ডাকলে দূরে / সাগরপারের গোপন পুরে', কখন ছিল সেই নিবিড় ঘন আঁধার যখন মনকে তাঁর শমিত করতে হচ্ছিল এই বলে : 'শোভন এই ভুবনে রাখিয়ো ভালোবাসা' ? 'বাঁশরি বাজাতে চাহি বাঁশরি বাজিল কই' শুনে ঠাট্টা করেছিলেন কৃষ্ণ-নগরের ধ্রুপদী শ্রোতারা, 'বাজাতে চাইলেই হয় না বাজাতে জানা চাই' বলেছিলেন তাঁরা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথেরও কেন মনে হচ্ছিল যে বাঁশরি বাজে না, কেন লিখেছিলেন ওই গান ? কোনো উপলক্ষ ছিল কি ? কোনো উপলক্ষ ছিল 'আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না' 'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে' অথবা 'আমার কণ্ঠ

১ গীতবিতান : কালানুক্রমিক সূচী। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

হতে গান কে নিল' ধরনের গানগুলির উৎসে? রবীন্দ্রনাথ যদিও বলেছিলেন 'শুধায়ো না কবে কোন্ গান/কাহারে করিয়াছিনু দান,' যদিও সমস্ত উপলক্ষের কূল থেকে সত্যিকারের গানের তরী ভেসে যায় চিরায়তের দিকে, এমনও নয় যে সব-রচনারই একটা সুনির্দিষ্ট ঘটনাপট আছে বা থাকা দরকার, তবু কখনো কখনো জানতেও ইচ্ছে করে কোনো রচনার পটভূমি, রচনাগুলিতে যেন একটা ব্যক্তিগত ছোঁয়া লেগে যায় এই জানার ফলে।

কৌতূহলী শ্রোতা যে এর কোনো-কোনো তথ্য নিজের চেষ্টায় আয়ত্ত করে নিতে পারেন না তা নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মকথায় বা স্মৃতিকথায়, তাঁর ডায়েরি বা চিঠিপত্রে কখনো-বা বলেছেন কোনো গান-রচনার প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গ; আমাদের সামনে আছে চার-খণ্ড 'রবীন্দ্রজীবনী'; আছে পুলিনবিহারী সেন -সংকলিত গ্রন্থপঞ্জী বা তথ্যপঞ্জী; ইন্দিরা দেবী বা সরলা দেবী, রথীন্দ্রনাথ বা কালিদাস নাগ, কানাই সামন্ত বা শান্তিদেব ঘোষ লিখেছেন তাঁর অনেক গানের বিবরণ। কিন্তু এর মধ্য থেকে তথ্য-সংকলনের কাজটা বড়ো সহজ নয়, এও বলা যায় না যে সে-সংকলন থেকে সম্পূর্ণ কোনো ধারাবাহিকতা ধরা পড়বে। শান্তিদেব লিখেছেন যে 'মধ্য-জীবনে দেখি ছন্দপ্রধান গানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বেশি ও আগের অনুপাতে ঢিমে লয়ের গানের সংখ্যা অনেক কম,' বা ইন্দিরা দেবী আমাদের মনে করিয়ে দেন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলতেন 'আগেকার গানগুলি ইমোশনাল এখনকার গুলি ইসথেটিক।' এসব শুনে যদি মনে হয় যে রবীন্দ্রসংগীত বিচারের একটা পদ্ধতিই যেন পাওয়া গেল সামনে, তাহলে প্রশ্ন উঠবে কোন্গুলিকে বলব মধ্যজীবনের গান আর কোন্গুলিই-বা তার আগের; ইমোশনাল আর ইসথেটিক-এর

এই ভিন্নতাটাই-বা ধরা হচ্ছে ঠিক কোন্ সময় থেকে? কিংবা রবীন্দ্রনাথ নিজেই যখন লেখেন 'প্রথম বয়সে আমি হৃদয়ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি গানে, আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। পরিণত বয়সের গান ভাব বাৎলাবার জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্য' তখন আমাদের জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয় প্রথম বয়স আর পরিণত বয়সের হিসেবটা হবে কীভাবে। ওই কথাটির পরেই আছে একটি গানের উল্লেখ, যাকে তিনি বলেন 'রূপ দেবার' গান তার উদাহরণ হিসেবে আনেন তিনি 'কেন বাজাও কাঁকন কনকন।' আর, যদি আমাদের জানা থাকে যে ওই গান লিখেছিলেন তিনি মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে, তাহলে বুঝতে পারি তাঁর মন্তব্যটিতে 'পরিণত বয়স' কথাটার তাৎপর্য কোন্খানে পৌঁছয়।

তাই আমাদের দরকার ছিল রবীন্দ্রনাথের গানগুলির একটি কালানুক্রমিক সূচী। একটি-দুটি গানের ক্বচিৎ কৌতূহল মেটানো নয়, আমরা অপেক্ষা করছিলাম এমন কোনো তালিকার যেখানে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর গানের পারম্পর্য ধরা থাকবে, কবিতার মতো গানেরও একটা ইতিহাস আনতে পারবে যে তালিকা। ভাবতে ভালো লাগছে যে এই প্রত্যাশা এখন পূর্ণ হবার পথে, 'গীত-বিতান : কালানুক্রমিক সূচী'র প্রথম খণ্ড আজ ইচ্ছে করলেই আমরা হাতের সামনে পেতে পারি। রবীন্দ্রনাথের জীবনী যিনি লিখেছেন, 'রবীন্দ্রবর্ষপঞ্জী'র যিনি প্রণেতা, এখন যিনি ব্যাপৃত আছেন 'রবীন্দ্রদিনপঞ্জী'র প্রস্তুতিতে, সেই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের হাত থেকেই এল এই বই। কোনো সন্দেহ নেই যে এখন থেকে এ-বই 'গীতবিতান'-এর সঙ্গীবই হিসেবে সব সময়েই কাজে লাগবে আমাদের।

২

'গীতবিতান' যখন প্রথম ছাপা হয়েছিল ১৩৩৮ সালে, তখন তার চেহারা ছিল আজকের 'গীতবিতান' থেকে একেবারেই ভিন্ন। প্রেম পূজা প্রকৃতির যে সহজ শ্রেণীকরণে অভ্যস্ত আমরা আজ, তার কোনো ইশারা ছিল না প্রথম সেই সংস্করণে। সেখানে গানগুলি ধরা ছিল যতদূর-সম্ভব গ্রন্থানুক্রমে। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'রও আগে লেখা যেসব গান গ্রহণযোগ্য বলে ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তার আশ্রয় ছিল 'কৈশোরক' বিভাগে, আর তার পর থেকে গানগুলিকে পাই ভিন্ন ভিন্ন বইয়ের নামে, কালপরম্পরায়। এবং ফলে, প্রতিটি গানের বিষয়ে আমাদের কৌতূহল তৃপ্ত হতো না যদিও, তবু এক-একটি গুচ্ছ বিষয়ে সময়ের খানিকটা ধারণা পাওয়া যেত নিশ্চয়।

কিন্তু 'গীতবিতান'-এর সেই চেহারা আজ নেই। তাই প্রভাত-কুমার-সংকলিত এই কালানুক্রমিক সূচী আজ দ্বিগুণ মূল্যবান। ১৩১৯ সালে ৩২০টি গানের তালিকা তৈরি করেছিলেন ইনি একটা পরীক্ষা হিসেবে; সেইটিকে বলা হচ্ছে এ-বইয়ের প্রথম সংস্করণ। আর এই দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩১৯) আমরা পাব প্রায় হাজারটি গানের বিবরণ; ১৩১৯ সালে ইয়োরোপ-যাত্রার আগে পর্যন্ত যে-সব গান লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এ হলো তারই এক বিবৃত সূচী।

যিনি জানতে চান কোন্ গান কোন্ বইতে ছাপা হয়েছিল প্রথম, কখন ছাপা হয়েছিল পত্রিকায়, রচনাই-বা কবে—এই তালিকা থেকে তিনি তার যথাসম্ভব নির্দেশ পাবেন। এই তালিকা-গুলি থেকে জানা যাবে গানগুলির পাঠ কখনো পালটেছে কিনা পরে, জানা যাবে এর সুর স্বরলিপি অথবা স্বরলিপিকারের খবর।

এই সূচী থেকে গীতানুরাগীরা দেখতে পাবেন কীভাবে এক-একটি মাঘোৎসব উপলক্ষে এক-একগুচ্ছ গান বাঁধছেন কবি, অথবা অন্য কোনো পারিবারিক অনুষ্ঠান কীভাবে তাঁর রচনার যোগ্য-ভূমিকা তৈরি করছে, কীভাবে—ইন্দিরা দেবীর ভাষায়—দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে এক ঝাঁক গান নিয়ে এলেন তিনি অথবা শিলাইদহ থেকে হয়তো আরেক ঝাঁক। এই সূচীর পাতা উলটে যে-কোনো সময়ে কেউ জেনে নিতে পারেন যে স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি লিখছিলেন 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে', কলেজে ছাত্রসম্মিলনীর ঈস্টার উৎসবে তৈরি করছেন 'তবু পারি নে সঁপিতে প্রাণ' অথবা কোনো শিশুর অন্নপ্রাশনে বলছেন 'ওগো নবীন অতিথি।' এই সূচী থেকে অনায়াসে আমরা জেনে নিতে পারি এই তথ্য যে নবীনচন্দ্রকে তাঁর রানাঘাটের বাড়িতে বসে রবীন্দ্রনাথ শোনাচ্ছিলেন সদ্য-রচিত 'এসো এসো ফিরে এসো' অথবা রাজনারায়ণ বসুর মেয়ের বিয়েতে রবীন্দ্রসংগীত গাইছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ (তখনো নরেন্দ্রনাথ): 'জগতের পুরোহিত তুমি' কিংবা এরকম আরো কয়েকটি গান।

একটি কবিতা থেকে আরেক কবিতায় পৌঁছতে রবীন্দ্রনাথ যে-পথ অতিক্রম করে যান তার অনেকটা ইতিহাস এখন আমাদের জানা আছে। এইবার, এই সূচীর দিকে লক্ষ রেখে, আমাদের পক্ষে সহজ হতে পারবে গানগুলির মধ্য দিয়েও রবীন্দ্রনাথের সেই যাবার পথ চিনে নেওয়া। তাই, কেবল গীতানুরাগীদের নয়, এই সূচী-সংকলন প্রয়োজন হবে রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা বুঝতে চান তাঁদের সবারই।

৩

বইটির দ্বিতীয় খণ্ড এখনো ছাপা হয়নি, সংকলনের কাজ চলছে নিশ্চয়। প্রথম খণ্ডও, আশা করি, অল্পকালের মধ্যেই নতুন করে ছাপতে হবে আবার। সেইসব ভবিষ্যৎ প্রকাশনের কথা ভেবে এখানে আমরা বইটির দু-চারটি দ্বিধাদুর্বলতার কথাও বলতে চাই। পরিমার্জনার সময়ে প্রভাতকুমার এবং তাঁর তরুণ সহায়ক দুজন ভেবে দেখতে পারেন একজন পাঠকের এই অসুবিধেগুলি।

প্রথম প্রশ্নই এই যে গানগুলির ক্রম তৈরি হবে কীভাবে? রবীন্দ্রনাথের বাইশশো গানের প্রতিটি কোন্ কোন্ দিনে লেখা হয়েছিল, তার পুরো নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা শক্ত নিশ্চয়। ফলে সংকলয়িতা প্রধানত নির্ভর করছেন এর প্রকাশকালের উপর। 'গীতবিতান' প্রথম সংস্করণের চেয়ে এর মূল্য বেশি এই কারণে যে সেখানে গানগুলি ধরা ছিল বই-প্রকাশের সময় অনুযায়ী, আর এখানে প্রভাতকুমার ব্যবহার করছেন সাময়িকপত্রে মুদ্রণকাল। কিন্তু যদি এমন হয় যে কোনো-কোনো গানের নিশ্চিত রচনাকাল জানা যাচ্ছে অন্য কোনো সূত্র থেকে, হয়তো-বা পাণ্ডুলিপি বা নির্ভরযোগ্য কোনো স্মৃতিচর্চা, তাহলে তারও কি বিন্যাস হবে প্রকাশকালের হিসেবে? আমরা জানি 'হ্যাদে গো নন্দরানী আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও' গানটি আছে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে (১৮৮৪), সংকলয়িতা তাই একে গণ্য করছেন 'বয়স ২৩।১২৯১।১৮৮৪'র তালিকা সূত্রে। কিন্তু 'জীবনস্মৃতি'তে তো কবি স্পষ্টই জানান যে গানটি তিনি লিখেছিলেন কারোয়ার থেকে ফিরবার পথে, 'বড়ো একটি আনন্দের সঙ্গে প্রথম গানটি জাহাজের

ডেকে বসিয়া সুর দিয়া গাহিতে গাহিতে রচনা করিয়াছিলাম—হ্যাদে গো নন্দরানী'—আর সেই কারোয়ার থেকে ফিরবার 'কিছুকাল পরে ১২৯০ সালের ২৪ অগ্রহায়ণে আমার বিবাহ হয়, তখন আমার বয়স বাইশ বৎসর।' এই স্পষ্ট তথ্যের পর যদি গানটিকে আমরা অন্তত ১২৯০-এর সূচীতেও না দেখতে পাই, তাহলে এ-বইয়ের ব্যবহারযোগ্যতা কি কমে যাবে না খানিকটা ?

এইরকমই হয়তো আরো কয়েকটির উল্লেখ করা যায়। কালিদাস নাগের বিবৃত তথ্য অনুযায়ী 'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে' স্বদেশী যুগের গান, 'রাজা' নাটক রচিত হবার পাঁচ বছর আগেই ১৩১২-১৩ সালে এর রচনা, কিন্তু এ-বইতে সেটিকে দেখছি আমরা ১৩১৭-র তালিকায়। সীতাদেবী তাঁর 'পুণ্যস্মৃতি'তে মনে করিয়ে দেন, 'প্রবাসী'তে ছাপা হবার সময়ে 'অচলায়তন'-এর পাণ্ডুলিপিতে যে-দুটি গান পুরো কেটে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তারই একটি হলো 'কবে তুমি আসবে বলে রইব না বসে।' অথচ, আমাদের সূচীর এই প্রথম খণ্ডে গানটিকে পাওয়া যাবে না, কেননা গানটি শেষ পর্যন্ত ছাপা হয়েছিল ১৩১৯ সালের অনেক পরে। আমরা কি ভেবে নেব যে এসব তথ্য বর্জনযোগ্য এইজন্যে যে খবরগুলি পাচ্ছি আমরা কেবল স্মৃতিকথা থেকে ? ঠিক, স্মৃতিকথা দলিল মাত্র, প্রমাণ নয়—কিন্তু সেই দলিলই তো এ-সংকলনের অন্য অনেক তথ্যন্যাসে সাহায্য করেছে দেখতে পাই। তার নানা উদাহরণের একটি যেমন এই (পৃ. ১৭১) 'প্রথম গান দুইটির রচনাকাল রবীন্দ্ররচনাবলীতে '১৩১৬ শান্তিনিকেতন' বলিয়া উল্লেখিত।... কিন্তু সীতাদেবী বলিয়াছেন যে গান তিনটি শারদোৎসব অভিনয়কালে রচিত' আর সেই নজিরে 'ওগো

শেফালিবনের মনের কামনা' বা 'আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি' সংগতভাবেই রাখা আছে এখানে ১৩১৮ সালের তালিকায়। আমরা ধরতে পারি না যে 'শুধু যাওয়া আসা শুধু স্রোতে ভাসা' কেন এখনো থাকবে ১২৯৯ সালের অন্তর্গত, যখন রবীন্দ্রনাথের 'পকেটবুক'-এর নজিরে আজ জানাই আছে যে ওটি তার আগের বছরে লেখা। অথবা কেনই-বা সংকলয়িতা বলেন যে এ-বইয়ের ২০৫-৩০৩ সংখ্যক গানগুলির রচনাকাল নির্দেশ করা সম্ভব হয়নি। কোনোটিরই নয়? কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুশোকে লেখা 'পুষ্পাঞ্জলি'র পাণ্ডুলিপিকাল ১২৯১, আর এখানে তো বলাও আছে যে সেই পাণ্ডুলিপির অন্যতম কয়েকটি গান হলো 'যে ফুল ঝরে সেই তো ঝরে' (২৬৯) 'কেন এলি রে ভালোবাসিলি' (২৭০) বা 'ওকে কেন কাঁদালি, ও যে কেঁদে চলে যায়' (২৮২)।

প্রশ্ন আছে আরো। কোনো গানের যদি ভিন্ন কোনো পাঠ তৈরি হয় কখনো, তাহলে সূচীতে তার উল্লেখ হবে কি একাধিকবার? না কি একবার বলেই তার অন্তর্গত বিবরণে পরবর্তী পাঠের নির্দেশ দেওয়া ভালো? দুরকম পদ্ধতিই চলতে পারে হয়তো, কিন্তু একইসঙ্গে দুরকম নয়। মনে হয় এ-বিষয়ে সংকলয়িতা মন স্থির করে নেননি। তাই, যদিও এখানে 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা' ১২৮৭ সালের কার্তিকের তালিকায় গৃহীত হয়েছে 'ভারতী'র পাঠে আর ফাল্গুনে এর নাম পাব 'তত্ত্ববোধিনী'র পাঠ-সূত্রে; যদিও 'তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে' একবার পাচ্ছি আমরা ১৩০১ এবং অন্যবার ১৩১৪ সালে; তবু 'ঝরঝর বরিষে বারিধারা' গানটি আছে একবারই, আছে 'ছিন্নপত্রাবলী'র নির্দেশিত সেই দিনটিতে, যখন এর চারটিমাত্র লাইন লেখা হয়েছিল

অনেকটাই ভিন্ন পাঠে : "ঝরঝর বরষে বারিধারা / ফিরে বায়ু হাহা-স্বরে জনহীন অসীম প্রান্তরে / অধীরা পদ্মা তরঙ্গ-আকুলা / নিবিড় নীরদ গগনে—!' 'ঝরঝর বরিষে বারিধারা'র প্রচলিত চেহারাটি প্রথম পাই 'কাব্যগ্রন্থাবলী'তে, তাই গৃহীত রীতি মানতে গেলে এর স্বতন্ত্র উল্লেখ বাঞ্ছনীয় ১৩০৩-এর সূচীতে। 'বঙ্গজননী মন্দিরাঙ্গন মঙ্গলোজ্জ্বল আজ হে' লেখা হয়েছিল ১৩১১ সালে, পরে তৈরি এর 'শান্তিমন্দির পুণ্য অঙ্গন হোক সুমঙ্গল আজ হে', ১৩৪৭ সালে লেখা হলো 'বিশ্ববিদ্যাতীর্থ প্রাঙ্গণ করো মহোজ্জ্বল আজ হে' : এই সবেরই খবর আছে একযোগে—যদিও এখানে নেই এই পাঠ-পাঠান্তরের সবচেয়ে পরিচিত রূপটি : 'মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন করো মহোজ্জ্বল আজ হে', যেটি তৈরি হয়েছিল বসুবিজ্ঞান মন্দিরের উদ্‌বোধনে, ১৩২৪ সালে।

কবিতা হিসেবেই প্রথমে লেখা হয়েছিল যে গানগুলি, সেই বিষয়ে আমাদের তৃতীয় প্রশ্ন। যেসব কবিতার রচনাকাল কবির যৌবন, নানা অনুষ্ঠানে যার সুরারোপ হয়েছিল অনেক বছর পেরিয়ে, সেসব গানের ক্রম হবে কোথায়? গণ্য হবে কোন্‌টি—কথারচনার কাল না সুররচনার সময়? ভূমিকায় প্রভাতকুমার ঠিকই লিখেছেন যে 'যে-গান যে-বয়সে রচিত হয়েছিল তখনই তা সার্থক রূপ পেয়েছিল,' কিন্তু এ-ক্ষেত্রে গানরচনার কাল বলতে কথারচনাই তো মূল্য পাবে বেশি? বস্তুত এ-ব্যাপারেও এই সংকলনে নির্দিষ্ট কোনো রীতি গ্রাহ্য করতে দেখি না। 'তবু মনে রেখো' গানটি রাখা আছে ১২৯৪ সালের তালিকায়, যদিও এর সুরারোপ ১২৯৯ সালের চৈত্রে, 'ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে' পাই ১৩০৪ সালে, যদিও তার ২৮ বছর পরে একে দেওয়া হল গানের পোশাক;

এইরকমই এখানে আছে 'নীল নবঘনে' বা 'হৃদয় আমার নাচে রে', 'হে নিরুপমা' বা 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি'—অথচ, জানি না কেন, এই তালিকায় আমরা খুঁজে পাই না 'নহ মাতা নহ কন্যা' 'কেন নিবে গেল বাতি' 'যাবই আমি যাবই' 'ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে' বা 'একদা প্রাতে কুঞ্জতলে অন্ধবালিকা'র মতো আরো অনেক গান।

সংগত কি এই তালিকায় অক্ষয় চৌধুরীদের রচনা ঢুকিয়ে দেওয়া ? রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে এই এক বিঘ্ন চলে আসছে আজ দীর্ঘকাল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর দ্বিজেন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবী বা অক্ষয় চৌধুরী, কেদারনাথ চৌধুরী বা এমন-কি যদু ভট্টের কোনো-কোনো গান রবীন্দ্র-সংগীত হিসেবে পরিচিত ছিল এক সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন গান নিয়ে কত রকমের বিতর্ক শুনেছি আমরা কত ভিন্ন সময়ে! কিন্তু তাঁর যেসব গান নিশ্চিতরূপেই অন্যের লেখা বলে প্রমাণ হয়ে গেছে আজ, তাও কি এই সূচীর অন্তর্গত হবার যোগ্য ? 'মুখের হাসি চাপলে কী হয়' প্রসঙ্গে সংকলয়িতা স্পষ্ট জানাচ্ছেন 'ইহা রবীন্দ্রনাথের রচনা নহে' (সাম্প্রতিক 'গীতবিতান'-এও নেই এ গান)—এরও পরে কি এর এই তালিকাভুক্ত হওয়া সংগত ? 'রাঙা-পদ-পদ্মযুগে' বা 'এত রঙ্গ শিখেছ কোথা' বিষয়ে ইন্দিরা দেবী নিঃসংশয়ে লিখছেন 'তাঁর (অক্ষয় চৌধুরীর) কতকগুলি গান সশরীরে রবিকাকার গীতিনাট্যে স্থান পেয়েছে, যেমন রাঙাপদপদ্ম-যুগে ও এত রঙ্গ শিখেছ কোথা।' এর পরেও কি এদের আমরা রবীন্দ্রসংগীতই ভাবব ? 'ছেলেখেলা কোরো না' বা 'দে লো সখী দে পরাইয়ে গলে' অথবা 'আজ তোমায় ধরব চাঁদ'-এর কোনোটিই এই সূচীতে প্রত্যাশিত নয়। এ ছাড়াও অন্য অনেকগুলি গান বিষয়ে

সংকলয়িতা অনুমান করেন যে সেগুলির রচয়িতা অক্ষয় চৌধুরী। সেই অনুমানের কোনো কারণও যখন তিনি বলেন না, তখন অনুমান-চিহ্নিত এই রচনাগুলির একটি স্বতন্ত্র তালিকাই কি বাঞ্ছনীয় নয়?

সূচীর একেবারে প্রথম গানটিতেই এই দ্বিধাজড়তা। 'গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে' 'গীতবিতান'-এরই গান, শেষ বয়সের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ ভেবেওছিলেন এটি তাঁর লেখা, কিন্তু ইন্দিরা দেবী স্পষ্ট জানাচ্ছেন যে এটি 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একেবারে প্রায় অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ করেছেন।··· কেউ কেউ ভুল করে ভাবেন এটি রবীন্দ্রনাথের।'

উলটোপক্ষে, যে-গান নিয়ে আজ আর সন্দেহ করবার কারণ নেই কোনো, বিস্তর বিতর্কক্রমে যে-গানটিকে এখন রবীন্দ্রনাথের বলে মনে করতে বাধা নেই আর, সেই 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি' রচনা-টির প্রসঙ্গে এখনো এখানে বলা আছে 'গানটি রবীন্দ্রনাথের রচনা কিনা তদ্‌বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।' 'গানটি যে রবীন্দ্র-নাথেরই রচনা ইহা আমরা কবির নিজের মুখেই শুনিয়াছি' লিখেছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিদেব একটি প্রবন্ধে বিস্তারিত দেখি-য়েছেন ওই একই তথ্য এবং কালিদাস নাগ মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর স্বরলিপিতে এটিকে রবীন্দ্ররচিত বলে উল্লেখ করেছেন। অন্তত, এই তথ্যাবলীর উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিক ছিল।

৪

কোনো দোষ ছিল না যদি প্রভাতকুমারের এই তালিকা শুকনো তালিকামাত্রই হতো। কিন্তু আমাদের লোভ বেড়ে যায় যখন দেখি

যে, কোনো গানের সঙ্গে সংকলয়িতা তার রচনাপটেরও বর্ণনা করেন অনেকটা, যখন গানের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের ইতিহাস অল্পস্বল্প জড়িয়ে যায়। 'এ কী এ সুন্দর শোভা' বা 'দিবানিশি করিয়া যতন' গান-গুলির সঙ্গে এ-তথ্য কারো বাহুল্য মনে হতেও পারে যে 'নরেন্দ্রনাথ দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে গানটি শোনাতেন।' কিন্তু 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' কীভাবে লেখা হয়েছিল তার বিবরণ বা 'জনগণমনঅধিনায়ক'-এর ইতিহাস অথবা মহর্ষির শ্রাদ্ধবাসর উপলক্ষে যে লেখা হয়েছিল 'দুখের বেশে এসেছ বলে তোমারে নাহি ডরিব হে'—এসব কথা নিশ্চয় বাহুল্য নয়। প্রভাতকুমার তা বলেনও এ-সংকলনে। কিন্তু তাহলে কেন পাই না এই বিবরণ যে 'আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না' গানটি বাঁধা হয়েছিল তারকনাথ পালিতের বাড়িতে কংগ্রেসী নেতাদের ইংরেজি ডিনারে গান গাইবার আমন্ত্রণে। ভালো হতো না কি এই তথ্য এখানে থাকলে যে 'ওলো সই ওলো সই' গানটি কবি তৈরি করেছিলেন মৃণালিনী দেবী আর অমলা দাশের সখীত্ব দেখে? নববিধান, আদি আর সাধারণ: ব্রাহ্মসমাজের এই তিন টুকরোর মিলিত উৎসব নিয়ে যে লিখেছিলেন তিনি 'পিতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সবে ভুলে যাও অভিমান,' ভালো হতো না কি গানটির সঙ্গে এই সংবাদের যোজনা? ভালো হতো 'বলি ও আমার গোলাপবালা' প্রসঙ্গে 'জীবনস্মৃতি'র এই মন্তব্যস্মরণ যে আমেদাবাদে শাহিবাগ প্রাসাদের প্রকাণ্ড ছাদে 'নিজের সুর দেওয়া সর্বপ্রথম গানগুলি রচনা করিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে 'বলি ও আমার গোলাপবালা' গানটি এখনো আমার কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে আসন রাখিয়াছে।' অথবা, 'বড়ো বেদনার মতো বেজেছে প্রাণে' প্রসঙ্গে এটা বলা যায় যে কবির মনে হয়েছিল

'সুরটা ঠিক হয়তো মজলিশি বৈঠকি নয়। এসব গান যেন একটু নিরালায় গাবার মতো।' নিশ্চয় উল্লেখ করার মতো এই তথ্য যে 'হা কী দশা হল আমার' সুরটির মূল পাওয়া গিয়েছিল দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের মুখে শোনা একটি ফারসি গান 'গালমে রবে রবা' থেকে, কিংবা এই তথ্য যে সরলাদেবী মহীশূর থেকে সংগ্রহ করে এনেছিলেন যে-সুর তারই আদলে তৈরি হলো 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে' 'এসো হে গৃহদেবতা' 'এ কী লাবণ্যে' বা 'চিরবন্ধু চিরনির্ভর'-এর মতো গানগুলি। এই সংকলনের হিসেবে বলা আছে যে 'এ শুধু অলস মায়া' কবিতাটির প্রথম গীতরূপ পাই 'কাব্যগীতি'তে (১৯২০); সেইসঙ্গে এখানে বললে ভালো ছিল শান্তিদেবের এই বিবরণ যে এটিকে '১৩২৬ সালেই প্রথম গানের দলে স্থান গ্রহণ করতে দেখি, তাই অনুমান করি ঐ সালের কিছু পূর্বে এটি গানে পরিণত হয়েছিল।'

সংকলয়িতা নিজেই ছেপেছেন এই বই, তাই মুদ্রণ নিয়ে অনুযোগ করার মানে নেই কোনো। তবু মনে করিয়ে দিই যে এ-ধরনের বইয়ের পক্ষে এখানে ছাপার ভুল একটু বিপজ্জনকভাবেই বেশি। সংশোধনের একটি তালিকা অবশ্য যুক্ত আছে সঙ্গে, কিন্তু সে-তালিকার বাইরেও মুদ্রণপ্রেতের অবাধ সঞ্চার। আর, কয়েকটি ক্ষেত্রে আমরা ঠিক নিশ্চিতও হতে পারি না যে সে কি ছাপারই ভুল না অন্য কোনো স্খলন। 'মধুর মধুর ধ্বনি বাজে' গানটির তারিখ তো ৫ নয়, ৬ আশ্বিন ১৩০২। 'ছিন্নপত্রাবলী'র নজিরে 'তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে'র যে পাঠ এখানে দেওয়া আছে তার প্রথম লাইনটি হওয়া উচিত ছিল 'ওগো তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে।' 'হা কী দশা হলো আমার' গানের 'হা'টিও এখানে

স্খলিত। 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' ১৮৮৬ সালের ডিসেম্বরে গীত বলে উল্লিখিত হলেও তালিকার শিরোদেশে দেখা যাচ্ছে ১৮৮৭ সাল (পৃ. ৬১)। 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা' (পৃ. ৯) প্রসঙ্গে সংকলয়িতা মন্তব্য করছেন 'ভগ্নহৃদয় পুস্তকাকারে প্রকাশকালে (১২৮৮ বৈশাখ) এই গানটির পরিবর্তে পাঁচ স্তবকে ৩০ পঙ্‌ক্তির কবিতা রচিত হয়। পরে প্রথম ৮ পঙ্‌ক্তি ব্রহ্মসংগীত রূপে ১২৮৭ সালের মাঘোৎসবে গীত হয়।' এখানে 'পরে' কথাটির কী অর্থ করব আমরা ? ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের গীতি-গ্রন্থগুলির বিবরণকালে 'হিতবাদী'র 'রবীন্দ্রগ্রন্থাবলী' (১৩১১) বা 'বাউল' (১৩১২) সংকলনটি কেন যে বর্জিত হলো, তারও তাৎপর্য বোঝা শক্ত। আর গোটা বইটির মধ্যে কখনো সাধুভাষা কখনো চলিত ভাষার সমাহার দেখেও বিব্রত হয়ে পড়ি আমরা।

৫

ত্রুটির বিবরণ হয়তো একটু দীর্ঘ হলো। এর থেকে কেউ যেন মনে না করেন যে বইটির লঘুকরণই আমার উদ্দেশ্য। এটা আমাদের মনে রাখতেই হয় যে এ ধরনের কাজের প্রথম কয়েক স্তরে কিছু পরিমাণে এসব বিভ্রম থাকাই সম্ভব। এ কোনো একলার কাজ নয়, যদিও একাই কাউকে দায়িত্ব নিয়ে শুরু করতে হয় একটা প্রাথমিক ভিত্তি। তার পরেই দরকার সমবেত পরামর্শের, সমবেত কর্মোদ্যমের। এর পর সেই উদ্যম যাঁরা করবেন একদিন, তাঁদের প্রতি পাঠকদের পক্ষ থেকে এই প্রশ্নগুলি সাজিয়ে রাখা হলো মাত্র। কয়েকটি সংস্করণের মধ্য দিয়ে, কয়েকবার শোধনের মধ্য দিয়ে, একদিন হয়তো এ সংকলন প্রত্যাশিত পূর্ণতা পাবে

সমস্ত অর্থে। আর তখন, রবীন্দ্রনাথের কোনো গান শুনতে শুনতে ঘটনা থেকে ঘটনাতীতের দিকে বা কাল থেকে কালাতীতের দিকে যাওয়া-আসার পথ হয়তো আরো সহজ হবে আমাদের।

কবে কোন্ গান : ২

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, তাঁর 'আমরা ও তাহারা' বইটির মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের গানের একটি যুগবিভাগ করেছিলেন অনেকদিন আগে। সে-বিভাগের নির্ভর ছিল সুরপ্রয়োগের বৈশিষ্ট্য। বলেছিলেন, প্রথম যুগে 'রাধিকাবাবুর মুখে ভালো ধ্রুপদ শুনে হিন্দুস্থানী কথার বদলে বাংলা কথা বসানোই তাঁর কাজ, যেমন—সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি, মন্দিরে মম কে; এইসব গান হিন্দুস্থানী সুরের তর্জমা। দ্বিতীয় যুগে তিনি কথায় ভালো ভালো সুর বসাচ্ছেন, যেমন—ঝরঝর বরিষে বারিধারা, রিমঝিম ঘন ঘন রে প্রভৃতি গান··· তৃতীয় যুগে তিনি সংগীত রচনা করলেন—বাহারের সঙ্গে মল্লার মিশল, ভৈরবীর সঙ্গে মিশল খাম্বাজ, বেহাগের সঙ্গে কেদারা।' সুরের দিক থেকে এই যুগভাগের যাথার্থ্য কতটা তা নিয়ে বিচার চলতে পারে, ভিন্নতর ভাবেও কেউ হয়তো কল্পনা করতে পারেন এই যুগগুলির, যেমন একবার করেছিলেন প্রমথনাথ বিশী: 'প্রথম বয়সের গানের মুখ বিরহমিলনপূর্ণ খণ্ড ক্ষুদ্র সংসারের দিকে, শেষ বয়সের গানের মুখ বিরহমিলনাতীত অখণ্ড সৌন্দর্যলোকের দিকে; মধ্য বয়সের গানে, অল্প কিছুদিনের জন্য এই দুই স্বতোবিরুদ্ধের মধ্যে সেতুবন্ধনের সুর।'

কিন্তু যে-কোনো রকম এই বিভাগের কল্পনায় প্রথম যা দরকার, তা তো নির্ভরযোগ্য তথ্য? নিশ্চিতভাবে তো জানা চাই কোন্ গান প্রথম যুগের আর কোন্‌টি বা শেষের? সেই তথ্যের

একটা অস্পষ্ট আদল নিশ্চয় এঁদের কাছেও ছিল, কিন্তু আদলটা অস্পষ্ট বলেই এসব সিদ্ধান্তে দু-একটি দুর্যোগেরও অবকাশ থেকে যায়। ধূর্জটিপ্রসাদ যেসব যুগের কথা বলেছিলেন, সেগুলির সীমা ঠিক হবে কীভাবে? 'মন্দিরে মম কে' গানটিকে প্রথম যুগের আর 'রিমঝিম ঘন ঘন রে' গানকে দ্বিতীয় যুগের বললে সে কি অনেকটা মনগড়া হয়ে যাবে না? একচল্লিশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'মন্দিরে মম কে', পঁচিশ বছর বয়সে 'সত্যমঙ্গল', আর বিখ্যাত 'রিমঝিম ঘন ঘন রে' তো কুড়ি-একুশ বছরের গীতিনাট্যের গান। এই কয়েকটি গানে সুরপ্রকৃতির ভিন্নতা কি তাহলে আর কালক্রম দিয়ে বিচার করা সম্ভব? ধূর্জটিপ্রসাদের মূল প্রতিপাদ্য হয়তো নাও পালটাতে পারে, কিন্তু সেজন্য দরকার ছিল উদাহরণগুলির আরো সতর্ক নির্বাচন।

দরকার ছিল, কিন্তু সহজ ছিল না। এ প্রবন্ধ যখন লিখেছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ, তখন হাতের সামনে সাজানো ছিল না রবীন্দ্রনাথের গানের কোনো কালানুক্রমিক সূচী, যে-সূচী দেখে আজ অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা বুঝে নিতে পারি রবীন্দ্রনাথের এগিয়ে যাবার পথটা, তাঁর পরিবর্তন আর পরিণতির ধরন। এ পথটা জানা না থাকলে, উৎসুক আর কৌতূহলী পাঠকদের কত-না ধাঁধা লাগে কত সময়ে। ধরা যাক, হয়তো আমরা জানি 'তুমি নব নব রূপে' গানটির সুর, জানি যে মিশ্র রামকেলিতে আজ গাওয়া হয় এ গান। হঠাৎ যদি সেইসঙ্গে মনে পড়ে যে ভৈরবীতে এর চার লাইন ফিরে ফিরে গাইছিলেন কবি পদ্মাতীরের কোনো এক সকালে, তাহলে কি ধরে নেব যে সে কথার ভুল রইল কিছু? স্মৃতিপ্রমাদ? মুদ্রণপ্রমাদ? গানটির ইতিহাস লক্ষ্যে রাখলে বুঝতে পারি যে তেমন-কোনো প্রমাদকল্পনা অনিবার্য নয় এখানে। ১৮৯৪

সালের সেপ্টেম্বরে গানের প্রথম কয়েক লাইন—ঈষৎ ভিন্ন পাঠে—গাইছিলেন একদিন, কিন্তু পুরো গানটি তৈরি হলো তার একযুগ পরে ১৯০৭ সালে। সকালে দেওয়া ভৈরবী সুর বিকেলে যাঁর কাছে খাম্বাজ হয়ে আসে, বহু বছরের এপারে-ওপারে ভৈরবীকে তিনি মিশ্র রামকেলি করে নিতে পারেন সহজেই, একথা বুঝতে অসুবিধে হয় না। তবে বুঝে নেবার জন্য যে গান রচনার এই বিবরণটিও আমাদের সামনে থাকা দরকার, সে-কথা ঠিক।

'গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী'র সম্পূর্ণ প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথের গানের সেই বিবরণ আজ আমাদের কাছে অনেকটা প্রত্যক্ষ। এ সূচীতে আজ আমরা পেয়ে যাব যে-কোনো গানের রচনাকাল বা প্রকাশকাল; কোথায় সে-গান ছাপা হয়েছিল, পাব তার নির্দেশ; কী উপলক্ষে লেখা, অনেকসময়ে তারও হিসেব পাব এ তালিকা থেকে। রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে যে-কোনো কথা উচ্চারণ করবার জন্য যাঁর সাহায্য আর নির্দেশ সব সময়ে আমাদের শিরোধার্য, পঞ্চাশ বছর জুড়ে যিনি গড়ে তুলছেন রবীন্দ্রজীবন আর রবীন্দ্রসাহিত্যের সমস্ত রকম তথ্যের সম্ভার, সেই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এ কাজটিও সম্পন্ন করলেন তাঁর এই সাতাশি বছর বয়সে, তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। দু-বছর আগে, ভুবনডাঙায় তাঁর বাড়ির বারান্দায় বসেছেন সকালবেলার নিয়মিত পড়াশোনার কাজে, এই দৃশ্য দেখে অভিভূত শিবনারায়ণ রায় প্রশ্ন তুলেছিলেন কারো কারো কাছে, কী করে এটা সম্ভব আমাদের দেশে। হতাশা আর নিষ্ক্রিয়তা যেখানে ব্যাধির মতো, অল্প শ্রমে বিরাট ফলের আকাঙ্ক্ষা যেখানে মজ্জাগত, সেই দেশের আবহাওয়ায় কীভাবে আজও দেখতে পাই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র

সেন বা সুকুমার সেনের মতো মানুষদের, অশীতিপর এই বয়সেও যাঁরা ছাত্রের চেয়েও ছাত্র ? স্বাভাবিক এ বিস্ময়, বিশেষ করে যখন আমরা জানি যে 'গীতবিতান'-এর এই কালনির্দেশ সম্পূর্ণ করবার পরেও প্রভাতকুমার থেমে যাননি তাঁর রবীন্দ্রচর্চায়, আজও তিনি ব্যস্ত আছেন রবীন্দ্রনাথের রচনাপঞ্জীর প্রস্তুতিতে—এমন-কী—তাঁর দিনপঞ্জী রচনারও এক অবিশ্বাস্য পরিকল্পনায়।

তবে, এ ধরনের কাজ গুছিয়ে তোলার অনেকগুলি স্তর থাকে নিশ্চয়ই। এটা বোঝা যায় যে এর সব-ক'টি স্তর সম্পাদন করে তুলতে কারো কারো সাহায্যেরও দরকার হবে সব সময়ে। সাহায্যের সেই ব্যবস্থায় সুবিধেও যেমন আছে, তেমনি অসুবিধেও হলো এই যে গোটা পঞ্জীর কেন্দ্রীয় বিন্যাসে কখনো কখনো দেখা দিতে পারে কিছু অসংগতি বা স্খলন। আমাদের মনে হয়, জীবন-তথ্য বা রচনাতথ্য সংকলনের কাজ হলো এক ধরনের বিরতিহীন সম্পাদনার কাজ, অনেকদিন ধরে অনেকের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠতে পারে সেটা। প্রভাতকুমার তাঁর প্রাথমিক দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন, বিপুল এই কাজের ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছেন তিনি। পাঠকদের আজ দায়িত্ব এই যে, এর ভবিষ্যৎ পরিমার্জনার সম্ভাব্য ইঙ্গিতগুলি তিনি তুলে দেবেন সম্পাদকের হাতে। সূচীর প্রথম খণ্ডটি নিয়ে একদিন কথা বলতে হয়েছিল তাই, এই দ্বিতীয়টির কিছু অসংগতি নিয়েও তেমনি জানাতে চাই দু-একটি ভাবনা।

২

১৯১২ সালে বিলেতে যাবার আগে পর্যন্ত লেখা গানের হিসেব ছিল প্রথম খণ্ডে। দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে আছে অল্প কয়েকটি

(১৭) গানের কথা, যা 'ভ্রমবশতঃ ১ম খণ্ড মুদ্রণকালে বাদ পড়িয়াছে'। এই তালিকায় 'যাবই আমি যাবই' গানটির বিবরণ প্রসঙ্গে শুনছি : 'গীতবিতান ১৩৩৮ সংস্করণে নাই'। কিন্তু, কবি যে 'তাসের দেশ' নাটকটির জন্য পুরোনো এক কবিতায় সুর দিলেন ১৩৪০ সালে, সেকথা বলবার পরে কি কেউ আশা করবেন যে ১৩৩৮ সালের গীতবিতানে কোনোভাবে এর থাকা সম্ভব? তারও চেয়ে বড়ো সমস্যা হয়, যখন বইটির ১৪৪ পৃষ্ঠায় এ তথ্যের উল্লেখ দেখি : 'হেরো, সাগর উঠে তরঙ্গিয়া'ও নেই গীতবিতানে। এখানে আর ১৩৩৮ নয়, এ হলো আধুনিক গীতবিতানেরই কথা। এটা ঠিক যে ও-বইয়ের সূচীতে কোথাও আমরা পাব না 'হেরো সাগর উঠে তরঙ্গিয়া', কিন্তু শ্রোতারা কি জানবেন না যে 'যাবই আমি যাবই' গানের এক অংশমাত্র ওটা? রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকে গানকে ব্যবহার করা হয়েছে সংলাপের মাঝখানে ভেঙে ভেঙে; এরও বিন্যাস যে সেই ভাবেই, তা লক্ষ না করলে তো 'নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ প্রবাল দিয়ে ঘেরা'-কেও স্বতন্ত্র গান বলে কল্পনা করতে হয়, আর সেও তো পাওয়া যায় না মূল গীতবিতানের সূচীতে! 'হেরো সাগর উঠে তরঙ্গিয়া'কে ভিন্ন একটি রচনা বলে দেখানো কি তাহলে সংগত হবে?

প্রথম খণ্ডের সঙ্গে জড়ানো আরো একটি গানের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। 'বঙ্গজননী মন্দিরাঙ্গন'-এর বিষয়ে বলা হয়েছিল এর নানা রূপান্তরের ইতিহাস, বলা হয়েছিল 'শান্তিমন্দির পুণ্য-অঙ্গন' অথবা 'বিশ্ববিদ্যাতীর্থপ্রাঙ্গণ'-এর কথা। এ গানের সবচেয়ে খ্যাত রূপ যে 'মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন', তার কোনো উল্লেখ ছিল না তখন। দ্বিতীয় এই খণ্ডে সে অপূর্ণতার মোচন হলো বটে, কিন্তু

সেইসঙ্গে উঠে এল নূতন কয়েকটি অসংগতি। 'বিশ্ববিদ্যাতীর্থ'-এর সূত্রে বলা হলো এবার : 'মাতৃমন্দির পুণ্য-অঙ্গন (১৩১১) গানের রূপান্তর।' হয়তো বলা উচিত ছিল যে 'বঙ্গজননী মন্দিরাঙ্গন'-এর ভিন্ন রূপ এটি, প্রথম খণ্ডের বিবরণের সঙ্গে মিলতও তাহলে, কিন্তু সেইটেই এখানে একমাত্র বিভ্রম নয়। আরো একটি ভুল দেখা দিল 'মাতৃমন্দির'-এর কালনির্দেশে। ১৩১১ সালে যেটি লেখা হয়েছিল সেটিই 'বঙ্গজননী', 'মাতৃমন্দির' তৈরি হলো ১৩২৪ সালে, আর ১৩৪৭ সালে 'বিশ্ববিদ্যাতীর্থ'-র সৃষ্টি। ১৩২৪-এর এই তথ্যটি কোথাও যে পাব না এ বইতে, তা অবশ্য নয়। ৩৮ পৃষ্ঠায় বলা আছে এই সময়েরই কথা, কিন্তু ১৯৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পৌঁছে সেটি হয়ে ওঠে ১৩১১!

পাঠান্তরিত গান সূচীতে স্বতন্ত্র গানেরই মর্যাদা পাবে কিনা, সেই নীতিটি প্রথম থেকে ঠিক করে নেওয়া হয়নি বলেও মনে হয়। এর ফলে 'মাতৃমন্দির' আর 'বিশ্ববিদ্যাতীর্থ'কে পাচ্ছি বটে ভিন্ন-ভিন্ন জায়গায়, ভিন্ন ভাবে পাচ্ছি 'আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায়' আর 'আমার নয়ন তব নয়নতলে', পাচ্ছি 'আমার কী বেদনা সে কি জানো' আর 'কী বেদনা মোর জানো', কিন্তু পাব না এখানে 'জানি জানি তুমি এসেছ এ পথে' বা 'মনে হলো পেরিয়ে এলেম'-এর রূপান্তর। আর, মাত্র একটিরই উল্লেখ যদি রাখতে হয় তাহলে —এই শেষ গানটির ক্ষেত্রে 'মনে হলো যেন পেরিয়ে এলেম'-এর অন্তর্ভুক্তিই কি সংগত হতো না? এটিই তো এ গানের পরিচিত রূপ? 'হৃদয় আমার, ওই বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে'র দুই ভিন্ন পাঠের কথা বলতে গিয়ে তৈরি হলো আরেক রকম বিপর্যয়। মুদ্রণপ্রমাদে 'ফাল্গুনী' শব্দটা রইল না স্বতন্ত্র রূপটিতে, কিন্তু রইল

এই তথ্য যে 'ফাল্গুনী ঢেউ'-এর রচনাকাল ১৩২৯ সালের জ্যৈষ্ঠ। গীতবিতানের গ্রন্থপরিচয়ে বলা ছিল : 'হৃদয় আমার ওই বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে (রচনা : জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯) গানের এই অভিনয় পাঠ ১৩৩৭ ফাল্গুনে নবীন-এর অনুষ্ঠানপত্রে মুদ্রিত হয়।' এর থেকে বুঝতে অসুবিধে নেই যে 'বৈশাখী ঝড়'-এরই রচনাকাল ১৩২৯ সালের জ্যৈষ্ঠ, আর 'ফাল্গুনী ঢেউ' এল ১৩৩৭ সালে। আমাদের এই সূচীতে উলটে গেল ইতিহাসটা, 'ফাল্গুনী ঢেউ' এখানে এল ১৩২৯-এর তালিকায় আর 'বৈশাখী ঝড়'কে পিছোতে হলো ওই বছরের শ্রাবণে।

আবার, অন্যদিকে, একই গানের দুই ভিন্ন উল্লেখে অনেক সময়ে বিব্রত হই আমরা। 'হে বিরহী, হায়' কি তাঁর বাহাত্তর বছর বয়সেরও, আবার চুয়াত্তর বছরেরও ? ১৩৪০ সালে এর রচনা, ১৩৪২-এ ছাপা হয়েছে এর স্বরলিপি, এই তো মাত্র ব্যাপার। আরো বছর চারেক পর 'শ্যামা'য় গানটি গৃহীত হলো যখন, তখনকার সূত্রে এলেও একটা হয়তো মানে পাওয়া যেত এর, কিন্তু ১৩৪০ আর ১৩৪২ দুই তালিকাতেই এর আবির্ভাবের কারণ দেখি না কোনো। এমন উদাহরণ যে এই একটিই মাত্র, তা নয়। 'আমার যে দিন ভেসে গেছে চোখের জলে' গানটিকেও পাচ্ছি ১৩৪৪ আর ১৩৪৫ দু বছরেরই তালিকায়। ১৭৮ পৃষ্ঠায় জানছি যে এর রচনার সময় সুনির্দিষ্ট নয়, তবে সংকলক অনুমান করেন ১৩৪৫-এর বর্ষাকাল। তাই যদি, তবে ১৬৯ পৃষ্ঠায় আমরা যে শুনে এসেছিলাম ১৩৪৪-এর বর্ষামঙ্গলে এটি গীত হয়ে গেছে, আর ছাপাও হয়ে গেছে সে-বছরের 'প্রবাসী'তে কার্তিক সংখ্যায়, এ খবর কি ভুল ? কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা ভুল ?

সময় জানানোই এ সূচীর সবচেয়ে বড়ো কাজ, কিন্তু সে কাজেই বেশ কয়েকটি অসতর্কতা থেকে-থেকে চোখে পড়ে। ১৩৩৭ সালের চৈত্র মাসে কলকাতার নিউ এম্পায়ারে প্রথম মঞ্চস্থ হলো 'নবীন', আর রচিত হয়েছে সেটা ফাল্গুনে, এই খবরের পরের নিশ্বাসেই আমাদের জানতে হলো যে, 'নবীন প্রথম কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয় ৩০ ফাল্গুন।' অথবা ধরা যাক আরেকটি গান, 'বুঝি ওই সুদূরে'। এর রচনাকাল বলে অনুমান করা হচ্ছে ১৩৩০ সালের ভাদ্র, কিন্তু দুটি বাক্য পরেই আমরা জানব যে '১৩২৯ বসন্তোৎসবের জন্য হিন্দিগান ভাঙিয়া' এটি তৈরি। তাহলে আর ১৩৩০-এর অনুমানটি রইল কেন এখানে? কেনই-বা ১৩২৯-এর তালিকায় জায়গা হবে না এর? 'ওগো বধূ সুন্দরী'র রচনা ২৭ ফাল্গুন ১৩৩০, ১০ মার্চ ১৯২৪। এত স্পষ্ট আর নিশ্চিতভাবে কথাটা জানাবার পর শান্তিদেব ঘোষের বই থেকে এই 'প্রামাণিক' উল্লেখের কী তাৎপর্য যে '১৩৩১ সালে একটি বিবাহের উপহারোপ-যোগী কবিতা [ওগো বধূ সুন্দরী/নব মধুমঞ্জরী] লেখেন'? এর মধ্যে কোনো একটি তথ্য নিশ্চয় ভুল? শান্তিদেবকে যদি ব্যবহার করতেই হয়, তাহলে বরং এখানে জরুরি হতে পারত এই খবর যে গানটি লেখা হয়েছিল গগনেন্দ্রনাথের একটি ছবিকে অবলম্বন করে, 'সাতভাই চম্পা' নামে। 'এসো শরতের অমল মহিমা' বিষয়ে এই সূচী থেকে আমরা জানলাম: 'স্বরবিতান ২য় খণ্ড তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে আছে—ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২৯।' তাহলে এ গান কেন আসবে ১৩৩২ সালের হিসেবে? সে কি এইজন্যে যে ওই সময়ে সুর দেওয়া হলো রচনাটিতে? তার একটা যুক্তি থাকতে পারে বটে, কিন্তু সেই যুক্তিতে তো 'ওগো বধূ সুন্দরী'রও জায়গা হবে প্রায় দশ বছর

পর ১৩৪০ সালের চৈত্রে পৌঁছে ? সেই সময়েই তো 'নব মধুমঞ্জরী' পালটে গিয়ে হলো 'তুমি মধুমঞ্জরী,' সাত ভাই চম্পার অভিনন্দন হয়ে দাঁড়াল পুলকিত চম্পার অভিনন্দন ?

আরেক সংকট তৈরি করছে 'রক্তকরবী' নাটকটি। এই নাটকের পাণ্ডুলিপিতে এমন কয়েকটি গান আছে যা শেষ পর্যন্ত পৌঁছয়নি মুদ্রিত রচনায়। 'এতদিন পরে মোরে' 'নূতন পথের পথিক হয়ে' 'কাজ ভোলাবার কে গো তোরা'—এমনি কয়েকটি গান। তালিকায় এদের জায়গা হবে কোথায় ? এই সূচীতে আমরা দেখছি ১৩৩৩ সাল। কেন ? 'রক্তকরবী' বইটির প্রকাশকাল ওই বছর, এইজন্যেই কি ? কিন্তু পত্রিকায় যে নাটক ছাপা হয়ে গেছে ১৩৩১ সালেই আর তার পর যে অন্য কোনো বদলও হয়নি এর, এ কথা তো আমরা জানি ? 'রক্তকরবী'র ন-দশটি পাণ্ডুলিপির কোনোটিই কি ১৩৩১-এর পরের ? এ সংকলনেরই ৮১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে : '১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে সংশোধিত বর্তমান আকারে নাটকটি 'রক্তকরবী' নামে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছিল। তাই আমরা এখানে 'রক্তকরবী'র গানগুলিকে ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসের মধ্যেই রচনাকাল ধরিয়া সন্নিবেশিত করিলাম।' বেশ। কিন্তু এ গানগুলি কেন তবে পিছিয়ে আসবে আরো দুবছর, কেবল বই প্রকাশের তারিখ লক্ষ করে ? আর, তা যদি আসবেই, তাহলে একেবারে ও-রকমই আরেকটি গান 'আমার মনের বাঁধন ঘুচে যাবে' কেন রয়ে গেল ১৩৩১ সালেই ? 'আমার শেষ রাগিণীর প্রথম ধুয়ো'-টিও যে 'রক্তকরবী'রই পাণ্ডুলিপিতে ছিল একসময়ে, সে-তথ্যের উল্লেখও কি এখানে প্রাসঙ্গিক হতো না ?

কালপরিচয় ছাড়াও এ বইতে অনেক সময়ে পাওয়া যাবে গান-

গুলির উপলক্ষ নির্দেশ। কী পরিবেশে কোন্ অভিপ্রায়ে লেখা হয়েছে কোনো গান, এর যদি নিশ্চিত হদিশ থাকে তো সেটা জেনে নেওয়াই ভালো। প্রভাতকুমারের মতো অভিজ্ঞ মানুষ এ বিষয়ে কখনো-কখনো তাঁর অনুমানও জানাতে পারেন অবশ্য, তবে সে-অনুমানের যুক্তিক্রম একটু স্পষ্ট হওয়া দরকার। এ কথা তো বুঝতেই হবে যে তাঁর মতো বিশেষজ্ঞের অনুমান জনসমাজে নিপাট তথ্যের মূল্য পেয়ে যেতে পারে। 'দুঃখরাতে, হে নাথ, কে ডাকিলে' গানটি মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু উপলক্ষে রচিত বলে তাঁর অনুমান ছিল একদিন, আপাতত এই 'অনুমান' অংশটি বাদ দিয়ে একে সুনিশ্চিত তথ্য বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে দেখতে পাই। বিশেষ এই গানটিকে নিয়ে সেজন্য কোনো অসুবিধে হয়তো নেই, কিন্তু অনুমানের প্রসার একটু বেশিদূর পৌঁছলে সেটা বিপজ্জনক হতে পারে বলে আশঙ্কা হয়। পঞ্চবটী প্রতিষ্ঠার উপলক্ষেই লেখা হয়েছিল 'আমায় থাকতে দে না আপন মনে', অতুলপ্রসাদ সেনের গৃহবাসের 'স্মৃতি-রোমন্থনে' রচিত হলো 'তোমার শেষের গানের রেশ নিয়ে কানে', অথবা মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর ঠিক কুড়ি বছর পূর্ণ বলেই লেখা হলো 'অনেক কথা বলেছিলেম কবে তোমার কানে কানে', এসব অনুমান গানগুলির পক্ষে খুব জরুরি হয়তো নয়। কিন্তু, যখন অনুমান করা হয় যে ১৩২৮ সালের অগ্রহায়ণে রচিত 'সার্থক করো সাধন' হয়তো-বা 'নটীর পূজা'র জন্য রচিত, তখন কেবল বিপদই বাড়ে, কেননা ও-নাটক তো লেখাই হলো ১৩৩৩ সালে। এই 'নটীর পূজা'র আরো একটি খবর বলা হয়েছে, ১৩৩১ সালের মাঘ মাসে নাকি কলকাতায় এর অভিনয়ে গাওয়া হয়েছিল 'ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়।' ১৩৩১ সালেই অভিনয়?

'মরণসাগর পারে তোমরা অমর' কোন্ ভাবনা নিয়ে লেখা? 'কলিকাতায় এই সময়ে চন্দ্রকান্ত সুর ও যতীন্দ্রনাথ সুর হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা রোধ করিতে গিয়া নিহত হন। তাঁহাদের স্মরণে গানটি রচিত।' এখানে অবশ্য অনুমানের কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু সূত্র হিসেবে আমাদের দেখতে বলা হচ্ছে 'প্রবাসী' পত্রিকা আর শান্তিদেব ঘোষের বই। শান্তিদেবের বই খুললে দেখা যাবে এ গানের সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিচয়, তিনি জানাচ্ছেন যে এটি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু উপলক্ষে লেখা, রবীন্দ্রনাথ নাকি এ গানের কথা মনে করতে গেলে বলতেন প্রায়ই, 'দাদার মৃত্যুর পর লেখা গানটি'। এই দুই ধারণার মধ্যে আমরা সামঞ্জস্য করব কেমন ভাবে? লেখায় দুঃখ বা মৃত্যুর কথা থাকলে বাস্তব কোনো মৃত্যুর অভিজ্ঞতা খুঁজে দেখা আমাদের অনেকের অভ্যাস, 'দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে' গানের সঙ্গে সেইজন্যেই বোধ হয় দেওয়া আছে Winternitz-এর মৃত্যুসংবাদ। কিন্তু খবরটি আসছে এইভাবে: রচনা ২৫ জানুয়ারি ১৯৩৭, আর 'জানুয়ারির শেষদিনে কবি খবর পান ১লা জানুয়ারিতে Winternitz-এর মৃত্যু হয়েছে। Winternitz-এর মৃত্যুর খবর পাবার আগেই গানটি রচিত।' তাহলে কি গানটি গাওয়া হয়েছে তাঁর স্মরণে? না, তাও নয়, মাঘোৎসবেই হয়ে গেছে সে-গান গাওয়া। তখন প্রশ্ন ওঠে, তাহলে এই গানের পাশে এত বিস্তারিত ভাবে Winternitz-এর মৃত্যুসংবাদ জেনে কী সুবিধে হবে আমাদের? কোনো টেলিপ্যাথির কথা কি বলতে চান সংকলক?

ওই বছরেই লেখা 'ওগো আমার চির অচেনা পরদেশী'র পাশে মন্তব্য দেখি 'ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর স্মরণে রচিত বলে অনুমিত'।

হঠাৎ এ অনুমানের কারণ ? 'বিদেশিনী' শব্দের প্রয়োগ থাকলেই ওকাম্পোকে ভাববার এক প্রলোভন হতে শুরু করেছিল কদিন আগে, এখন কি তবে 'পরদেশী' দেখলেও সেই ফাঁদে পা দেব আমরা ? যে-গানের সঞ্চারীতে আছে 'প্রভাতে একা বসে গেঁথেছিনু মালা / ছিল পড়ে তৃণদলে অশোকবনে', যে-গান শেষ হয় এই দীর্ঘশ্বাসে 'তুমিও কোথা গেছ চলে / বেলা গেল, হল না আর দেখা', তাকে সরাসরি ভিক্টোরিয়ার স্মরণ হিসেবে অনুমান করতে গেলে কেবল-মাত্র সদিচ্ছা ছাড়া আরো কোনো প্রত্যক্ষ তথ্যের কি প্রয়োজন নেই ?

৩

ইতস্তত বিচ্ছিন্ন কয়েকটি উদাহরণ মাত্র বলা হলো এখানে, সমস্যার ধরনটা বোঝাবার জন্য। এ ছাড়া আরো কয়েকটি কথা উঠে আসে নীতির বা তত্ত্বের প্রশ্নে, যা নিয়ে মতভেদ সম্ভব। গানের এই তালিকা তৈরি করবার সময়ে 'গান' শব্দটিকে কতদূর নিয়ে যাব আমরা ? রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যে বা নৃত্যনাট্যে যে রচনা আছে, এই তালিকায় তার বিন্যাস হবে ঠিক কেমন ভাবে ?

গদ্যনাট্য বা পদ্যনাট্যে যেমন, তেমনি গানের ব্যবহার আছে গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্যেও। ভারি সহজ এই কথাটার মানে হলো, গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্যে সুরবাহিত সংলাপের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময়ে পাওয়া যায় পুরো একটি গানেরও প্রয়োগ। 'নববসন্তের দানের ডালি'র মতো গান দিয়েই শুরু হয় 'চণ্ডালিকা', কিন্তু তার অল্প পর থেকেই দেখা দেয় চরিত্রগুলির সুরসংলাপ, আবার তারও পর মাঝে মাঝে চলে আসে গান, 'যে আমারে পাঠাল এই' 'ওগো ডেকো

না মোরে ডেকো না' অথবা 'ফুল বলে ধন্য আমি' যেমন। 'শ্যামা'য় আছে 'হে বিরহী, হায়' 'ফিরে যাও কেন ফিরে ফিরে যাও', আছে 'মায়াবনবিহারিণী'র মতো কোনো গান যা হয়তো গাওয়া হয়েছে টুকরো টুকরো করে। এসব গানের সঙ্গে নিশ্চয় এক প্রকৃতিগত প্রভেদ করতে হবে 'শ্যামা'র 'থাম রে থাম রে তোরা ছেড়ে দে ছেড়ে দে' বা 'ক্ষমা করো নাথ ক্ষমা করো'র মতো টুকরোর, 'চণ্ডালিকা'র 'ওরে বাছা দেখতে পারি নে তোর দুঃখ' কিংবা 'লজ্জা! ছি ছি লজ্জা'র মতো উচ্চারণের? বিধিমতো গানের তুলনায় এই সুরসংলাপের প্রাধান্যের জন্য নৃত্যনাট্যের নাটকীয়তা বেড়ে যায় কতটা, এদিক থেকে বেশ-একটা তুলনা হতে পারে কিনা 'চণ্ডালিকা' আর 'শ্যামা'র, সে অবশ্য ভিন্ন এক সমস্যা। এখানে আমাদের প্রশ্ন এই, গানের তালিকায় এই ছিন্ন টুকরোগুলিকেও কি স্বতন্ত্র গান হিসেবেই গণ্য করব আমরা, না কি এর জন্য ভিন্ন কোনো সূচী করে দেওয়াই ভালো? প্রভাতকুমার একই তালিকায় এদের সাজাতে চেয়েছেন বলে এই দাঁড়াচ্ছে যে 'হাঁ মা, আমি বসেছি তপের আসনে'র লাইনটিকে বলতে হলো একটি গান, আর তার পরের গান হয়ে এল 'তোর সাধনা কাহার জন্যে'। ঠিক এইভাবেই এক লাইনের গান হিসেবে সংখ্যাত হচ্ছে এ সূচীতে 'চণ্ডালিকা'র 'কেন গো কী চাই' 'উড়ো পাখি আসবে ফিরে এমন কী গুণ জানি' 'কী অসীম সাহস তোর মেয়ে' 'ওরা কে যায় পীত-বসনপরা সন্ন্যাসী', অথবা 'শ্যামা'র 'কী আছে তোমার পেটিকায়' 'আছে মোর প্রাণ আছে মোর শ্বাস' কিংবা শেষ পর্যন্ত 'ধর ধর, ওই চোর, ওই চোর'। প্রভাতকুমারের যুক্তি এই যে স্বরবিতানেও এদের ভিন্ন ভিন্ন করে দেখানো আছে। কিন্তু সুর পালটে যাচ্ছে

বলে স্বরবিতানে তো ভিন্ন করে দেখাতেই হবে এদের। সে-ক্ষেত্রেও শুধু লক্ষ করবার যে সেখানে এগুলি ছাপা হয়েছে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় একটানা, অন্যান্য স্বরবিতানের ধরনে স্বয়ংসম্পূর্ণ গানের চেহারায় নয়।

গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্যের এই নীতিটি স্পষ্ট না করে নিলে পরিসংখ্যানেরও একটি অসুবিধে দেখা দিতে পারে হয়তো। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় বেশ বিস্তারিত হিসেব দিয়েই বলা হয়েছিল যে গীতবিতানের মোট গানের সংখ্যা ২২৩২। কিন্তু 'শ্যামা'-'চণ্ডালিকা'র যে সাতটি টুকরোর উল্লেখ করেছি এইমাত্র, তার তিনটিকে পাওয়া যাবে গীতবিতানের সূচীতে, পাওয়া যাবে না বাকি চারটিকে। এই কারণে এবং নিশ্চয় আরো নানা কারণে, প্রভাতকুমারের সূচীতে গানের সংখ্যা এখন দাঁড়াল ২১৭৭। খুঁজে পাই না এখানে 'অসুন্দরের পরম বেদনায়' বা 'আমার মনের কোণের' মতো কোনো-কোনো গান, কিন্তু সংখ্যাগত গরমিলের সেইটেই একমাত্র কারণ নয়। পাঠান্তরিত রচনাগুলিকে একই গান বলে ধরা হবে, না ভিন্ন গান, নৃত্যনাট্য-গীতিনাট্যের হিসেবটাও হবে ঠিক কীভাবে, এসবেরও ওপর হয়তো নির্ভর করছে এই সংখ্যার যাথার্থ্য।

বইটিতে সংগত ভাবেই নির্দেশ করা আছে নানা প্রামাণিক উৎসের। এরই মধ্যে একবার বলেছি যে, উৎসের সঙ্গে উল্লেখের ঠিক সামঞ্জস্য হয়নি অনেক সময়ে। অন্যদের সঙ্গে সামঞ্জস্য হয় না যখন, তখন সমস্যা এক রকমের। কিন্তু 'রবীন্দ্রজীবনী'রই সঙ্গে মেলে না যখন এই সূচীর তথ্য, তখন আমরা ধরে উঠতে পারি না কোনটির ওপর ভর করব। এমন অনেক উদাহরণের দু-একটি হলো, 'হাটের ধুলা সয় না যে আর'-এর রচনাকাল একটিতে বলা আছে ২৯ ফাল্গুন অন্যটিতে ২ চৈত্র, আর ঠিক পরেই 'পাখি বলে, চাঁপা

আমারে কও' একটিতে ২ চৈত্র অন্যটিতে ১৫ চৈত্র। গীতবিতান তৃতীয় খণ্ডের অথবা কোনো-কোনো সময়ে বিশ্বভারতী রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয় থেকে বিস্তারিত সাহায্য নেওয়া হয়েছে অনেক তথ্যের, একটু অসতর্কভাবে প্রায়ই সেখানে থেকে গেছে উদ্ধৃতিচিহ্নহীন অবিকল তার বাক্যাবলীর ব্যবহার। অবিরাম এ অসতর্কতার সবচেয়ে সংকটময় চেহারাটি আছে ১৪৩-৪৪ পৃষ্ঠায় 'তাসের দেশ' প্রসঙ্গে। এই নাটকের পরিচয় হিসেবে প্রায় ষোলো লাইন যে কথা বলা আছে এই সূচীতে, তার সবটাই রবীন্দ্র-রচনাবলী থেকে গৃহীত বলে এ লাইনও এখানে রয়ে গেল যে 'প্রহসনটির[১] বর্তমানে প্রচলিত উক্ত পরিবর্ধিত পাঠ মুদ্রিত হইল'। বলা বাহুল্য, ওই প্রহসনের কোনো পাঠই মুদ্রিত হয়নি এখানে, হবার কথাও নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন বলা হচ্ছে যে আরো তথ্যের জন্য 'দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩/৫৪৩-৪৪, এখানে নাটকটির সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে', তখন পাঠক একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন, কেননা এ বইতে গৃহীত ওই ষোলোটি লাইন ছাড়া রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয়ে আর যে 'বিস্তারিত আলোচনা' আছে, সে তো কেবল এর গানগুলির তালিকা। সে-তালিকার জন্য রচনাবলী কেন খুলতে হবে আর, তারই জন্য তো আমরা খুলেছিলাম এই সূচী।

৪

ছোটোবেলা থেকে পড়া 'কণিকা'র সেই বহুখ্যাত লাইনটি ভুলে যাচ্ছি না, সব সময়েই আমাদের মনে রাখতে হয় এই কথা: 'কাজ

১. রচনাবলীতে অবশ্য 'প্রহসন' শব্দটি নেই, আছে নাটিকা।

করি আমরা যে, তাই করি ভুল।' অভ্রান্ত চুল হয়ে বসে থাকার চেয়ে ভুলের সম্ভাবনা নিয়েও অক্লান্ত কাজ করছেন যিনি, তিনি শ্রদ্ধেয়। আর সে-মানুষ যদি হন প্রভাতকুমারের মতো এক প্রতিষ্ঠান, তাহলে আমাদের সব সমালোচনাকেই রুদ্ধ করে নিতে হয় কোনো এক প্রণতিতে। তবু যে এ কথাগুলি লিখতে হলো, তা কেবল এইজন্যে যে, অন্য যে-কোনো বইয়ের তুলনায় তাঁর এই কীর্তিগুলিকে আমাদের অনেক বেশি প্রাত্যহিক সঙ্গী বলে মনে হয়, প্রায় অভিধানের মতো মুহূর্তে মুহূর্তে আমাদের কাজে লাগে তাঁর বই। এ বইয়ের ছোটোখাটো বিচ্যুতিগুলি যদি সরিয়ে নেওয়া যায় দ্রুত এর পরবর্তী কোনো সংস্করণে, আমাদের ভবিষ্যৎ পাঠক-দের পক্ষে তাহলে এই 'কালানুক্রমিক সূচী' হতে পারবে রবীন্দ্র-নাথকে জানবার এক নিশ্চিত নির্ভর, স্পষ্ট আদলে তিনি জানতে পারবেন কীভাবে রবীন্দ্রসংগীতের এক যুগ থেকে আরেক যুগে 'নূতন ভাবনা রূপ নিচ্ছে নূতন ভাষায়', সে নূতনত্ব ধূর্জটিপ্রসাদের বলা সুরের ভিন্নতাতেই হোক, কিংবা প্রমথনাথ বিশীর নির্দেশিত জীবন আর সৌন্দর্য -লোকের কল্পিত দোলাচলের মধ্যেই হোক।

গানের তথ্য, গানের সত্য

মায়াকভস্কি একদিন মস্কোর দিকে চলেছেন ট্রেনে, কামরায় ছিলেন অন্য এক তরুণী। কিছু যে খারাপ লোক নন তিনি, সে-কথা বোঝাবার জন্য তরুণীটিকে বললেন : আমি তো মানুষ না, আমি এক ট্রাউজারপরা মেঘ। কিন্তু কথাটা বলেই তাঁর চমক লাগল, চেতনার মধ্যে বিঁধে রইল ওই 'ট্রাউজারপরা মেঘ' কথাটা, বুঝতে পারলেন কোনো কবিতার সৃষ্টি হতে চলেছে শব্দগুলির মধ্য দিয়ে। কিন্তু মেয়েটি কি ব্যবহার করে ফেলবে এটা, নষ্ট করে ফেলবে? পরের আধঘণ্টা জুড়ে সেই উদ্‌বেগ নিয়েই তিনি আলাপ করতে লাগলেন তার সঙ্গে, আর বুঝে নিলেন যে সে একেবারেই লক্ষ করেনি ওই সম্ভাবনাময় শব্দগুচ্ছ। এর প্রায় দু বছর পর লেখা হলো মায়াকভস্কির দীর্ঘ সেই প্রসিদ্ধ কবিতা : ট্রাউজারপরা মেঘ।

ঘটনার সঙ্গে কবিতার যোগ অনেক সময়েই এইটুকু মাত্র। কোনো একটি মুহূর্তকে বা বিষয়কে স্পর্শকের মতো ছুঁয়ে দিয়ে অনেক দূরে চলে যায় কবিতা, ঘটনাবৃত্তকে ছাড়িয়ে। আর তখন কেবলমাত্র সেই ঘটনার গণ্ডিতে রেখে কবিতাকে বোঝা যায় না কিছুই। 'সানাই' বইতে রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছিলেন 'ওগো আমার প্রাণের কর্ণধার / দিকে দিকে ঢেউ জাগাল লীলার পারাবার', তার সূচনা যে ছিল রচনাটির বেশ কয়েক মাস আগে, কোনো-এক তরুণীরই সান্নিধ্যে ছুটিতে-পাওয়া এক দিনে শুরু হয়েছিল এর 'হে তরুণী তুমিই আমার ছুটির কর্ণধার' হিসেবে, সে-কথাটা তথ্য হিসেবে

আকর্ষণের হলেও কবিতাটির কাছে পৌঁছতে কি তা খুবই সাহায্য করে আমাদের? প্যারিসের এক বৃদ্ধ দোকানির সামনে দাঁড়িয়ে রিলকের মনে হঠাৎ উঠে এসেছিল কয়েকটি শব্দ : 'অনির্বচনীয়ের এই শুরু।' এই আবেগ থেকে দেখা দেবে কবির 'অর্ফিয়ুসের প্রতি সনেট'গুচ্ছের সুদূর সূত্রপাত, কিন্তু ওই দোকানির সঙ্গে কোনো যোগ আর থাকবে না তার। দাঙ্গার তাড়ায় আহত একটি ছেলে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে, আক্রমণকারীরা ঢিল ছুঁড়ছে তাকে অমানুষিক-ভাবে, জল থেকে মাথা তুলতে পারছে না সে, এই দৃশ্যের অভিজ্ঞতা ছিল বিষ্ণু দের 'জল দাও' কবিতার পিছনে, কিন্তু কবিতাটি শুধু ওই ঘটনার অনুবাদমাত্র নয়। কবিতা পড়বার সময়ে, এই কথাটা আমাদের মনেই রাখতে হয় যে সৃষ্টিকালীন মুহূর্তের সঙ্গে সৃষ্টির যোগসম্পর্কটা ঠিক সরল চালে সাজানো নেই, ঘটনার যথাযথ প্রতিফলন হিসেবেই বুঝে নেওয়া যায় না সব শিল্পকে।

২

সহজ এই কথাগুলি হঠাৎ আবার মনে পড়ল রবীন্দ্রসংগীতের একটি রেকর্ড শুনতে গিয়ে। কিছুদিন আগে আমাদের হাতে এসে পৌঁছল শান্তিদেব ঘোষের গাওয়া নূতন একটি লংপ্লেয়িং, প্রচলিত ধরন থেকে একটু ভিন্নভাবে সাজানো বারোটি গানের গুচ্ছ। কেবলই গান নয়, গানের সঙ্গে গায়ক এখানে আরো কিছু দিতে চান আমাদের, শোনাতে চান প্রতিটি গানের রচনাকালের ইতিহাস, ঘটনার বিবরণ। 'প্রতিদিনের সাধারণ বাস্তব ঘটনাগুলি গুরুদেব রবীন্দ্র-নাথের মনে যেভাবে প্রতিফলিত হতো, তার প্রকাশ মাঝে মাঝে দেখা গেছে তাঁর গানে', এইটে মনে রেখে গানগুলির সঙ্গে গায়ক

আমাদের জানাচ্ছেন 'রচনার পিছনের ইতিহাসটি।' শুনে মনে পড়ে যে রবীন্দ্রসংগীতের সাম্প্রতিক আসরগুলিতেও এখন প্রায়ই একলা থাকে না গান, বৈচিত্র্যের ইচ্ছেয় সেখানেও যুক্ত থাকে কখনো কোনো বিচার, কখনো কোনো খবর। হবারই কথা সেটা। রবীন্দ্রনাথের গানে আমাদের টান তো কেবল সুরেরই জন্য নয়, তার কথারও জন্য, আর কথার সেই ইতিহাসকে বা তার বিকাশকে যদি লক্ষ করেন শ্রোতা গান শুনবার মুহূর্তেও, ক্ষতিই-বা কী তাতে, এই হয়তো ভাবি আমরা। যা ছিল আসরের লক্ষণ, এবার তা উঠে এল রেকর্ডেও। অনুমান করি যে শান্তিদেবের এই রেকর্ডের পর অনুরূপ প্রকাশ আরো আমরা দেখতে পাব অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই।

কোনো একটি গানের সঙ্গে সে-গানের রচনাকালের উল্লেখ আমাদের জ্ঞানের গণ্ডি বাড়ালেও কোনো সাংগীতিক বোধ বাড়ায় কিনা, সে-প্রশ্নও কেউ তুলতে পারেন নিশ্চয়। কেউ বলতে পারেন যে গান তো রচনাকালীন সেই সময়টিকে উত্তীর্ণ হয়ে সরে এসেছে অনেক দূর, সেখানে আর আমাদের ফিরিয়ে নেবার দরকার কী। নিছক গানটির দিক থেকে সে-দরকার অবশ্যই নেই, কিন্তু সুরের মধ্য দিয়ে সুরকারকেও যদি আমাদের ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে কখনো, যদি তাঁর মনের বিচিত্র উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে দেখতে চাই তাঁকে, তাহলে কবিতার ধারাবাহিকতার মতো গানের ধারাবাহিকতাও আমাদের আস্বাদনকে ভিন্ন চেহারা দিতে পারে অনেকটা, এতে নিশ্চয় সন্দেহ নেই।

তাই শান্তিদেব যে তাঁর লংপ্লেয়িং-এ নির্বাচন করে নেন ১৮৯৫ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন সময়ের লেখা বারোটি গান, আর

কালপরম্পরায় সাজিয়ে নেন তাকে, তার ফলে অল্প অবসরের মধ্যে রবীন্দ্রসংগীতের পরিণতিপথের কোনো-একটা ইঙ্গিত হয়তো মিলতেও পারে। কিন্তু শ্রোতাদের সমস্যা হয় তখন, যখন তাঁরা লক্ষ করেন যে বারোটি গানের প্রসঙ্গে এই তথ্য-সংকলনের অনেকটাই আমাদের ভুল খবর জানাচ্ছে গানগুলির রচনাকাল বিষয়ে। এই কালনির্দেশ অপরিহার্য নয় গান শুনবার পক্ষে তা ঠিক। কিন্তু যদি সে-নির্দেশ দিতেই চান কেউ, তবে তো তাঁকে ঠিক খবরই বলতে হবে?

প্রথমেই আমাদের চমক লাগে যখন এই রেকর্ডের তৃতীয় গান 'দুঃখরাতে, হে নাথ' বিষয়ে শুনতে পাই যে '১৯০১ খ্রীস্টাব্দে' কবিজায়া মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু উপলক্ষে লেখা সেটি। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু? সকলেই, শান্তিদেবও, জানেন যে, ওই বছরেই শুরু হলো শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়, আর সে-কাজে সর্বার্থে রবীন্দ্রনাথের সহকর্মিণী ছিলেন মৃণালিনী। কলকাতায় তাঁর মৃত্যু তো এর ঠিক এক বছর পর ১৯০২ সালের নভেম্বরে। 'দুঃখরাতে' গানটি প্রথম গাওয়া হয়েছিল তারও মাসদুয়েক পরের মাঘোৎসবে ১৯০৩ সালে, ছাপা হলো ফাল্গুনে। হতেও পারে যে ওই মৃত্যু-স্মৃতিরই অভিঘাতে লেখা এ গান, কিন্তু ১৯০১ সালে লেখা নয় সেটা, মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুও তেমনি নয় ও-বছরের কোনো ঘটনা।

এই চমক মিলিয়ে যাবার আগেই ১৯১৮ সালের 'সে কোন্ বনের হরিণ'কে শোনা যায় ১৯১৭-র গান হিসেবে অথবা ১৯২৫-এর 'রুদ্রবেশে কেমন খেলা' হয়ে যায় ১৯২৪ সালের। 'সময় কারো যে নাই' বিষয়ে যে নভেম্বরের বদলে বলা হলো সেপ্টেম্বর অথবা 'সর্ব খর্বতারে' প্রসঙ্গে ভাদ্রের বদলে আশ্বিন, সেটা হয়তো তত বড়ো সমস্যা নয়, কিন্তু খুবই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় যখন 'আমার কণ্ঠ হতে'

বা 'দুই হাতে কালের মন্দিরা'র মতো গানগুলিতে বিপর্যয় দেখতে পাই প্রায় ন-দশ বছরের। রেকর্ডটি থেকে আমরা জানছি যে ১৯৩২ সালের বর্ষামঙ্গলে অন্যান্য ছাত্রছাত্রী আর অধ্যাপকদের সঙ্গে শান্তিদেবও গিয়েছিলেন জোড়াসাঁকোয়, আর তখনই রবীন্দ্রনাথের গলা বসে যাওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে তৈরি হলো 'আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল।' কিন্তু ব্যক্তিগত স্মৃতি নিশ্চয় তাঁকে বঞ্চনা করছে এখানে, কেননা 'গীতবিতান'-এর যে প্রথম সংস্করণ ছাপা হয়ে গেছে ১৯৩১ সালেই, তারই মধ্যে আছে ওই গান, আর এর স্বরলিপিও পাওয়া যাচ্ছে ১৯২২ সালের 'নবগীতিকা'য়। গানটি যে লেখা হয়েছিল ওইরকমই এক স্বরবিপর্যয়ের পর, সে-কথা ঠিক। কিন্তু সে-ঘটনা আরো দশ বছরের পুরোনো, সে হলো ১৯২২ সালের বর্ষামঙ্গলের কথা। সিন্ধু আর কাথিয়াবাড় থেকে ফিরবার সময়ে ওদেশের এক চাষী পরিবারকে কবি নিয়ে এসেছিলেন সঙ্গে, দুহাতে মন্দিরা নিয়ে তাদেরই এক কিশোরী মেয়ের নাচ দেখে মুগ্ধ কবি লিখেছিলেন 'দুই হাতে কালের মন্দিরা', এই তথ্যের উল্লেখ করেন শান্তিদেব। কিন্তু যথার্থ এই তথ্যের সঙ্গে খবর দেন যে এটিও লেখা ১৯৩১ সালে। কেমন করে তা হবে? রবীন্দ্রনাথের সিন্ধুভ্রমণ এবং তার অনুষঙ্গে শান্তিনিকেতনে এসে কিশোরী ওই মেয়েটির নাচ ছিল ১৯২৩ সালের এক অনুষ্ঠান! এ গানও আমরা পাব 'প্রবাহিনী'তেই (১৯২৫), এবং স্বরলিপি মিলবে 'গীতমালিকা'য় (১৯২৬)।

সময়নির্দেশের এই গরমিলকে লক্ষ করলে, গানগুলিকে যে ধারাবাহিকতায় সাজিয়েছেন শান্তিদেব, তার ক্রমেরই একটা বদল হয়ে যাবার কথা। সেই ক্রমের ইতরবিশেষে আমরা যে খুব বিপন্ন

হয়ে পড়ি তা নিশ্চয় নয়, কিন্তু বারোটিমাত্র গানের এই বিবরণে সাতটির প্রসঙ্গেই এমন তথ্যস্খলন দেখে একটু আশ্চর্যই লাগে আমাদের। এর মধ্যে দুটি ভুলের কারণ হয়তো বাংলা সাল থেকে খ্রীস্টীয় সালে ঘুরিয়ে আনবার অসতর্কতা, দুটিতে আছে কেবল মাসের হিসেবে অসংগতি, কিন্তু 'দুঃখরাতে' 'আমার কণ্ঠ হতে' আর 'দুই হাতে কালের মন্দিরা' গান তিনটি নিয়ে কীভাবে এতটা ভুল হতে পারল তা কল্পনা করা খুব সহজ নয়। এমন নয় যে এর কোনো একটিও তথ্য শান্তিদেবের কিছুমাত্র অজানা, বস্তুত তাঁর নিজেরই 'রবীন্দ্রসংগীত' বইটির মধ্যে পাওয়া যাবে এর অনেকগুলি গানের ঠিক-ঠিক খবর, কিন্তু রেকর্ড করবার সময়ে তিনি অথবা বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড সতর্ক হননি খুব, তারই ফলে এই দুর্ঘটনা। আরো একবার মনে করিয়ে দিতে চাই যে, কোনো-একটি গান এ-বছরে লেখা হলো না ও-বছরে, সে-খবরের উপর কিছুই হয়তো নির্ভর করে না আমাদের রসবোধ, রেকর্ডে সে-তথ্য না থাকলেও ক্ষতি নেই কিছু। কিন্তু থাকেই যদি খবর, আর সে-খবর যদি বাঙালি শ্রোতাদের কানে পৌঁছতে থাকে শান্তিদেবের মতো কোনো সর্বমান্য রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞের মুখ থেকেই, তাহলে সতর্কতার অভাবে যে অতথ্যকেই তথ্য বলে মানতে হবে একদিন, আর মৃণালিনী দেবীর মতো ব্যক্তিরও মৃত্যুকাল নিয়ে অকারণ এক সংশয় তৈরি হবে কখনো, সে বড়ো সুখের কথা নয়।

৩

কালনির্দেশ ছাড়াও গানগুলির সঙ্গে আছে 'বাস্তব ঘটনা'র উল্লেখ। এখানে যে সমস্যা উঠে আসে তা কোনো ভুলের প্রশ্নে নয়, এ হলো

সংগতির প্রশ্ন। এমন কি হতে পারে না যে ঘটনার এই বিবরণ ঘিরে থাকলে কোনো-কোনো গানের চার দিকে কখনো-বা অনভিপ্রেত এক শেকলই দেখা দিতে থাকে?

গান বা কবিতার বিশেষ একটা ধরন হতে পারে যেখানে রচনার ইতিহাস সেই লেখাটিকে বুঝতে সাহায্যই করে। দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলন বিষয়ে উদাসীন বড়োলোকদের সাহেবি আসরে গান গাইতে বলা হলে স্যার তারকনাথের বাড়িতে তিনি গেয়েছিলেন 'আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না', এই খবরে 'এসেছি কি হেথা যশের কাঙালি / কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি'র মতো শব্দগুলি ভিন্ন একটা তাৎপর্য পেয়ে যায়, সেই খবরের একটা মানে আছে তাই। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের উপলক্ষে কিছু গান বেঁধেছিলেন তিনি, গানের সঙ্গে জড়িয়ে নেওয়া যায় সেই আন্দোলনের স্মৃতি, গানের উদ্দীপনা বেড়েই ওঠে তাতে। এই রেকর্ডে যখন 'সর্ব খর্বতারে দহে'র ইতিহাসটুকু বলা হয়, যখন জানা যায় যে লাহোর জেলে অনশনব্রতী যতীন দাসের মৃত্যুসংবাদ শান্তিনিকেতনে পৌঁছলে বন্ধ হয়ে যায় 'তপতী' নাটকের মহড়া, আর তার পরেই ওই নাটকের প্রথম গান হিসেবে রচিত হয় ওই লেখা, তখন নিশ্চয় 'দুঃখের মন্থনবেগ' বা 'প্রস্তর শৃঙ্খলোন্মুক্ত ত্যাগের প্রবাহ' বস্তুসংঘাতময় প্রত্যক্ষ জীবনের প্রত্যাশিত একটি ছবিও নিয়ে আসে সঙ্গে। বসন্তোৎসবে আকস্মিক এক ঝড়ের তাণ্ডবের ফলে লিখতে হলো 'রুদ্রবেশে কেমন খেলা, কালো মেঘের ভ্রূকুটি,' এই খবর গানটিকে আঘাত করে না কোথাও, যদিও খুব সন্তর্পণে খবরটিকে অতিক্রম করে উঠে আসে তার এই সাধনারও কথা 'যদি তোমার কঠিন ঘায়ে / বাঁধন দিতে চাও ঘুচায়ে / কঠোর বলে টেনে নিয়ে

বক্ষে তোমার দাও ছুটি।' বর্ষামঙ্গলের এক অনুষ্ঠানে পিছনসারির শ্রোতাদের কাছে পৌঁছয়নি অনেকের স্বর, এই শুনে পরের সন্ধ্যার জন্য তৈরি হলো 'থামাও রিমিকিঝিমিকি' গানটি, এ তথ্যও গানের পক্ষে বাধাজনক হয় না কোথাও। এমন-কী, অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলিতে রবীন্দ্রনাথ যখন দেশে ধিক্কৃত হচ্ছিলেন বাঁশি বাজানোর অপরাধে, তারই পটভূমিতে যে লেখা হলো 'সময় কারো যে নাই', এ কথা শুনবার সঙ্গে সঙ্গে গানটির মায়া বেড়েই যায় আরো, হয়তো অনেক স্পষ্টভাবে তখন আমরা ছুঁতে পারি তাঁর এই বেদনা 'গান হায় ডুবে যায় কোন্ কোলাহলে', বুঝতে পারি কেন তাঁকে সান্ত্বনা পেতে হয় এই বোধে যে 'বিশ্বের কাজের মাঝে জানি আমি জানি / তুমি শোনো মোর গানখানি।'

কিন্তু উলটোপক্ষে, এমন অনেক লেখা আছে, রচনাকালীন ইতিহাস যে-লেখার অনুভবকে বাড়ায় না কোথাও, বরং খর্বই করে তাকে। রবীন্দ্রনাথের গান ভালোবাসেন এমন একজনকে জানি, সংগতভাবেই তিনি বিচলিত হয়ে আছেন 'সে কোন্ বনের হরিণ' গানটির ভাষ্য জেনে। দিনেন্দ্রজায়া কমলাদেবীর পোষা হরিণকে মেরে ফেলেছিল গ্রামের সাঁওতালেরা, তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই এ গান লিখেছিলেন কবি, এ কথা জানবার সঙ্গে সঙ্গে বড়ো বেশি মাত্রাহীনভাবে সামনে এসে দাঁড়ায় প্রাত্যহিক, বড়ো বেশি শীর্ণ অনুবাদের মতো হয়ে ওঠে এর কথাগুলি। 'সে কোন্ বনের হরিণ' পর্যন্ত গানটি থাকে সাধারণ এক স্তরে, কিন্তু যে-মুহূর্তে উচ্চারিত হয় ওই বাক্যের পরবর্তী অংশ 'ছিল আমার মনে' তখনই সে-গান ঝাঁপ দিয়ে উঠে যায় অনেক দূরে, হরিণটি তখন বিশেষ কোনো হরিণমাত্র হয়ে থাকে না আর। সুরের শব্দের মায়ায় সে হয়ে ওঠে

যেন আমাদের অনেক অব্যক্ত আকুলতার কোনো প্রকাশ। সেখান থেকে কেন আবার তাকে নামিয়ে আনব ছোটো একটা খবরের দিকে? লাল কাঁকরের পথে উড়ে যাচ্ছে পুরোনো এক ছেঁড়া চিঠির টুকরো, এই ছবি দেখেই মনে জেগে উঠেছিল 'লিখন তোমার ধূলায় হয়েছে ধূলি', নিজেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন এ কথা। কিন্তু তবু, ওই লাইনটির পরেই যে তুচ্ছ হয়ে গেছে এই কাঁকরের পথ, মানে পালটে গেছে এই লেখনের বা অক্ষরের, সে-কথা তো বুঝতে আমাদের কষ্ট হয় না যখন শুনি 'বনে বনে তব লেখনলীলার লেখা'র আবেগ। 'পুরোনো আখরগুলি' তো জেগে উঠছে এখন নবকিশলয়ে, মল্লিকাবনে, মাধবীশাখায়। দুহাতে দুটি মন্দিরা নিয়ে নেচে উঠেছিল ভিন্‌প্রদেশী এক কিশোরী, সেই তথ্যের থেকে কত দূরেই-না সরে যায় 'কালের মন্দিরা'র ধ্বনি, তার শাদাকালোর কান্নাহাসির দ্বন্দ্ব, তার মরণবাঁচনের নৃত্যসভার কথা। ঠাণ্ডায় গলা বসে গেছে, গান গাইতে পারবেন না হয়তো অনুষ্ঠানে, এই আশঙ্কার গল্পটুকু বলে দেবার পর যদি গাওয়া হয় 'আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল'র মতো আশ্চর্য এক গান, সে কি তখন আর ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেয় আমাদের? 'আধো ঘুমে আধো জাগায়' যে সুর জেগে ওঠে গভীর রাতে, প্রাণে যে পাখার ছায়াবুলানোর কথা শুনি, তার আবেশটা যেন ছিঁড়ে যেতে চায় ওই তুচ্ছতার টানে।

হয়তো এরও চেয়ে বেশি আঘাত নিয়ে পৌঁছয় 'অনেক কথা যাও যে বলে' আর 'সখী প্রতিদিন হায়' গানদুটির প্রসঙ্গকথা। প্রতিমাদেবীর পালিতা কন্যা নন্দিনীর সঙ্গে আধো-আধো বাক্যালাপে তার শিশুসুলভ কথাগুলিকে বুঝতে পারার আশা ছেড়ে দিয়েই রবীন্দ্রনাথকে বলতে হলো 'অনেক কথা যাও যে বলে কোনো কথা

না বলি', এটা নিশ্চয় এ গানের কোনো সত্য নয়। এ হলো সে-ই রকমের এক উড়াল নেবার জায়গা, সেই রকমের টুকরো এক অভিজ্ঞতা, কবিকল্পনা যেখান থেকে উড়ে যেতে পারে বড়ো এক বোধের দিকে, মায়াকভস্কির 'ট্রাউজার পরা মেঘ' কথাটি যেমন তাকে সরিয়ে নিয়েছিল দূরে। যে-গানের কথায় আমরা শুনি 'তোমারে তাই এড়াতে চাই ফিরিয়া যাই চলি' অথবা 'আমার চোখে যে-চাওয়াখানি ধোওয়া সে আঁখিলোরে', সে যে আর শিশুকন্যা নন্দিনীর কাছে নিবেদিত নয়, তাকেই বলা নয়, এ তো সহজ কথা। ইন্দিরা দেবী বলেছিলেন বিয়ের আগে তাঁর হতাশ পাণিপ্রার্থীদের অনেকের মধ্যে একজন নাকি প্রায়ই এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন তাঁদের বাড়ির উলটো দিকে মাঠের এক গাছতলায়, আর সেইটে নিয়েই রবিকাকা লিখেছিলেন 'সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে'! এটা হওয়া খুবই সম্ভব যে ঘটনাটি শুনে কৌতুকভরে কবির মনে উঠে এসেছিল ওই লাইন, কিন্তু 'তারে আমার মাথার একটি কুসুম দে' নিশ্চয় আর এ অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে না একেবারেই, তখন তা হয়ে ওঠে একেবারে ভিন্ন এক বেদনাময় প্রেমানুভবের গান। এ কথাও মনে রাখবার মতো যে গানটি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন নাগর নদীতে বোটের ওপর, মেঘবৃষ্টির মধ্যে ১৩০৪ সালের ১০ আশ্বিন। এই আশ্বিনের সূচনা থেকেই তিনি আছেন নদীতে নদীতে, ইছামতী যমুনা বড়াল নাগর নদী বা চলন-বিলে, আর গান লিখে চলেছেন একের পর এক। ইন্দিরা দেবীর ওই ভাবনাটি নিশ্চয় ঈষৎ দূরবর্তী হয়ে গেছে তখন।

কথাটি কি তবে এই যে প্রাসঙ্গিক এই তথ্যগুলি আমরা জানতে চাই না কখনোই? একেবারেই তা নয়। সৃষ্টির ইতিহাস

নিয়ে নিশ্চয় কৌতূহল আছে আমাদেরও। কবির ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির সম্পর্ক যখন জানতে চাই আমরা, জানতে চাই শিল্প আর বাস্তবের টানাপোড়েনের নানা রহস্যময় দিক, এসব তথ্য তখন আমাদের কাজে লাগে অনেক। আমাদের কৌতূহল তৃপ্ত হয়, ভালো লাগে ভাবতে, কত তুচ্ছ ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে কত সামান্য ঘটনার মধ্য দিয়ে একজন কবি তুলে আনেন তাঁর অসামান্য রচনার কোনো উপাদান। কিন্তু গান শোনার উপভোগের মুহূর্তে এই তথ্যের যোজনা কতটা সংগত, এই শুধু আমাদের প্রশ্ন। গানের সঙ্গে তথ্যের এই ব্যবহার যে কেবল ওই রেকর্ডটিতে দেখা যাচ্ছে তা নয়, একে বলা যায় আমাদের সাম্প্রতিক রবীন্দ্রসংগীত-চর্চার একটি বৈশিষ্ট্য, প্রভাতকুমারের দুখণ্ড 'কালানুক্রমিক সূচী' ছাপা হবার পরেই এই প্রবণতার এত সহজ প্রসার দেখা দিচ্ছে আমাদের দেশে। তাই এই সময়টিতেই একবার ভেবে দেখা ভালো, শ্রোতৃ আসরে এসব গান ঠিক কতটা তথ্যের ভর সইবে। 'রাজা' নাটকে রাজার মুখে শুনেছিলাম একবার, রানীর কৌতূহল হয়েছে বলে তিনি দেখা দিতে চান বাইরে। শুনে সুরঙ্গমা বলেছিল : 'কৌতূহলের জিনিস হাজার হাজার আছে, তুমি কি তাদের সঙ্গে মিশে কৌতূহল মেটাবে?—রানী, তোমার কৌতূহলকে শেষকালে কেঁদে ফিরে আসতে হবে।' গান বা যে-কোনো বড়ো শিল্পের অভিজ্ঞতার সামনে যখন দাঁড়াই আমরা, তখন কৌতূহলকে ছাপিয়ে উঠতে চায় ভালোবাসা, সেই মুহূর্তে যদি আমাদের কিছু-বা কৌতূহলেরই দিকে টেনে নেন কেউ, রাজার বদলে তবে কি সুবর্ণকেই দেখতে হবে না শুধু?

১৯৮০

অপ্রকাশের প্রকাশ

হঠাৎ হাতে এসে পৌঁছল পুরোনো জীর্ণ এক খাতা, ভিতরে জীবনানন্দের একটি প্রবন্ধের অনুলিপি, দাদামশায়ের মৃত্যুতে তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি। পড়িনি কখনো আগে এই লেখা, হয়তো ছাপাও হয়নি কোথাও, অনেকের হয়তো জানাও নেই এর কোনো খবর। ফলে নিছক খবর হিসেবেই এ একটা উত্তেজনা নিয়ে আসে, পাঁচ-জনকে ডেকে বলতে ইচ্ছে করে কথাটা। কিন্তু কেবল খবর হিসেবেই কি? লেখাটি পড়লে মনে হয়, জীবনানন্দকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে জানবার পক্ষেও কারো কাজে লাগতে পারে ছোটো এই রচনাটিকে, আমাদের চকিত করতে পারে তাঁর এইসব মন্তব্য যে, 'তখনকার দিনে [উনবিংশ শতকে] ভারতবর্ষের মানুষের চৈতন্য অর্থনীতিকের চেয়ে রাজনীতিক ছিল বেশি' বা 'যতদূর মনে হয় মানুষের ব্যবহারিক জগতে এই মার্ক্সীয় নীতি ও তার প্রয়োগের ভিতর থেকে অধিকতর মঙ্গলের সৃষ্টি হবে' কিংবা তাঁর এই বিচার যে 'দাদু কবি ছিলেন' আর তাঁর 'কবিতা বাংলা সাহিত্যে অনন্য-সাধারণ জিনিস।'

কয়েকজন যা জানতে পারছেন তা জানুন সকলেই, এই এক আগ্রহ থেকে তখন এ লেখাকে ছেপে দেওয়ার ইচ্ছে হতে পারে কারো। আর আমরা তো জানি, অপ্রকাশিতের এই রকম কত আকস্মিক প্রকাশে নূতন অভিজ্ঞতার জগৎ খুলে গেছে আমাদের সামনে। 'মাল্যবান' বা 'সুতীর্থ'র মতো উপন্যাস, অথবা জীবনা-

নন্দের গল্প, তাঁর কবিতার বেশ-কিছু, এসব তো আমরা পড়তে পেরেছি অপ্রকাশিতের প্রকাশ হিসেবেই, রচনাকাল আর প্রকাশ-কালের কতটাই দূরত্ব এসব ক্ষেত্রে। আজ মনে হবে, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসেও যেমন স্মরণীয় এই ঘটনা যে চলতিধারার পাশাপাশি সেদিন ওরকম গল্প উপন্যাস লিখছিলেন কেউ, তেমনি লক্ষণীয় হয়ে থাকবে জীবনানন্দের কবিতার সঙ্গে তাঁর এই গল্প-গুলির আড়াআড়ি এক যোগ, যার মধ্য দিয়ে তাঁর মন আরো জটিলতায় প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে পারে আমাদের সামনে।

আবার, মাত্র কয়েকটি লেখা নয়, মৃত্যুর অনেক পরে প্রকাশিত হচ্ছে প্রায় সমস্ত লেখাই, জীবনকালে যাঁর নাম জানবার সুযোগ হয়নি পাঠকদের, প্রকাশের পর তাঁকে মনে হচ্ছে সে-ভাষার প্রধান একজন শিল্পী, এমন উদাহরণও দেশ-বিদেশে ছড়ানো আছে কত! এমিলি ডিকিনসন তিরিশ বছর বয়স পেরিয়ে যাবার পর অনেক সংকোচে চারটি কবিতা পাঠিয়েছিলেন খ্যাত এক সমালোচকের কাছে, জানতে চেয়েছিলেন তাঁর লেখার কোনো মানে আছে কিনা, উচিত হবে কিনা তা কোথাও ছাপানো। সমালোচকটির সঙ্গে তাঁর চিঠিপত্র চলেছিল কিছুদিন। কিছু-যে বস্তু আছে ওসব লেখায়, সে-কথার স্বীকৃতি মিলেছিল বটে, কিন্তু মেলেনি প্রকাশের কোনো উৎসাহ, ফলে ডিকিনসনের কবিতা পাঠকের কাছে এসে পৌঁছতে পারল মাত্র ১৮৯০ সালে, তাঁর মৃত্যুরও চার বছর পর। একেবারে প্রথম যে-কটি কবিতা পাঠিয়েছিলেন এমিলি, তার মধ্যে ছিল এইটেও : 'The nearest Dream recedes—unrealized'! হয়তো ভাবা যায় যে প্রত্যাহত ওই লাইন-ক'টি কবির কাছে ফিরে এসেছিল নিয়তির পরিহাসের মতোই।

তাই, কোনো লেখকের অপ্রকাশিত রচনার প্রকাশ সম্ভাবনার কথা আমাদের মনে যে উৎসাহ জাগিয়ে তোলে তা নিশ্চয় স্বাভাবিক, সংগত আর স্বাস্থ্যজনক। এরই মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে এসে পৌঁছতে পারেন একেবারে নূতন কোনো কবি, ডিকিনসন বা হপকিন্সের মতো যাঁকে আমরা আবিষ্কার করে নিচ্ছি এই প্রথম, অথবা, জানা লেখকেরও কোনো অজানা মুখচ্ছবি এক ঝলক দেখা যেতে পারে অজ্ঞাতপূর্ব এইসব লেখার আকস্মিক কোনো প্রকাশে।

কিন্তু তবু, কখনো-কখনো এ আশঙ্কাও হয় যে, আবিষ্কারের উৎসাহ আমাদের টেনে নিতে পারে কোনো সমস্যার দিকে, প্রায় কোনো বিপজ্জনক সীমান্ত পর্যন্ত। কবিতা যিনি লেখেন, অথবা গল্প নাটক, তাঁর একটা নেপথ্যঘরও তো থাকবার কথা? সে-ঘরে অনেক আলগা লেখাও থাকা কি সম্ভব নয়, রচনা অথবা মন্তব্য, যার প্রকাশ হয়তো সত্যি-সত্যিই চাইতেন না তিনি? কোনো-একটি লেখা লিখতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন তিনি, ক্ষোভে আর হতাশায় ছেড়ে দিলেন সেটা, এমন ঘটনা অসম্ভব নয়। এও অসম্ভব নয় যে, লেখা সাঙ্গ করবার অনেক পর—এমন-কী পত্রিকায় তার মুদ্রণেরও পর—মনে হলো তাঁর যে হয়নি ওটা কিছু, উচিত নয় তার পুনঃপ্রকাশ। কোনো-একটি কবিতার বই সাজিয়ে তুলবার সময়ে রচিত আর প্রকাশিত অনেক কবিতাকে যে বর্জন করেন কবি, সবটাই হয়তো স্থানাভাবে নয়, তার অনেকটাই হয়তো তাঁর ব্যক্তিগত বিচার এবং বিবেচনায়, হয়তো তিনি অগ্রাহ্যই করতে চেয়েছিলেন কোনো-কোনো লেখাকে। নিজের রচনার মানদণ্ডেই তাকে অযোগ্য বলে মনে হতে পারে তাঁর, কখনো-বা মনে হতে পারে পুনরাবৃত্তিতে ক্লান্ত, কিংবা 'কল্পনামনীষা'য় দীন, আর সেইজন্যেই পাঠকদের প্রতি শ্রদ্ধায়

হয়তো তিনি দূরেই সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন সেই রচনাকে। কতটা সংগত সেসব রচনার পুনর্গ্রন্থনা? স্পেণ্ডার বলেছিলেন বটে যে কবির নোটবুক তাঁর পক্ষে যথাসর্বস্ব, কিন্তু পাঠকের পক্ষে সেটা তো কেবল কৌতূহলের বিষয়। কতটা সংগত এসব কৌতূহলকে প্রশয় দেওয়া?

এ প্রশ্নের অবশ্য একটা পালটা প্রশ্ন সম্ভব। প্রথমত, কীভাবে আমরা জানব কোন্‌টিকে সত্যিই দূরে রাখতে চেয়েছিলেন কবি, আর কোন্‌টিকেই-বা পাঠকের সামনে এগিয়ে দিতে পারলে খুশি হতেন তিনি? দ্বিতীয়ত, কবিই যে তাঁর লেখার সবচেয়ে বড়ো বিচারক, তাই বা এত নিশ্চিত রূপে মেনে নেওয়া যায় কেমন করে? এমন তো হতেও পারে যে বর্জনযোগ্য বলে যাকে ভাবছেন তিনি, তারই মধ্যে দ্যুতি দিচ্ছে কোনো শ্রেষ্ঠ রচনার ইঙ্গিত। তাই ভবিষ্যৎ পাঠকের কাছে, পস্টারিটির কাছে, আজকের সমালোচক বা সংগ্রাহকের দায় কি এই নয় যে বিচারবিহীনভাবে তিনি প্রকাশ করে যাবেন পেয়ে-যাওয়া উপাদানের সমস্তটাই? যদি-বা সে-লেখায় দৈন্যের চিহ্ন থাকে কোনো, কবির গোটা ব্যক্তিত্বকে বুঝে নেবার কাজে তারও সাহায্য কি লাগে না আমাদের অল্প-বিস্তর? একটি-কোনো লেখার যদি পাওয়া যায় অনেক খসড়া, অনেক পাঠান্তর, তবে তার প্রকাশ এবং বিচারের সূত্র ধরে আমরা কি বুঝতে পারি না রচয়িতার মনের অনেক রহস্য? তাঁর সৃষ্টিপদ্ধতির কি অনেকটাই জানা হয়ে যায় না আমাদের?

ঠিক। তুচ্ছ-রচনা চিঠির-টুকরো বিচ্ছিন্ন-মন্তব্য ডায়েরির অংশ অথবা পাণ্ডুলিপির এমন-কী প্রুফের সংশোধন, এর সবই আমাদের কাজে লেগে যায় হয়তো, সৃষ্টিকে জানবার জন্য ততটা নয়, সৃষ্টি-

পদ্ধতিকে জানবার জন্য যতটা। পাঠকের সেখানে তেমন গরজ নেই আর, তিনি তখন মিলিয়ে যান দূরের কোনো পটভূমির দিকে, সামনে এগিয়ে আসেন শুধু গবেষক। 'শিল্পের জন্যই শিল্প' আন্দোলনের মতো সমালোচনার শাস্ত্রেও তখন বড়ো হয়ে ওঠে 'পদ্ধতির জন্যই পদ্ধতি'র এক মোহময় আহ্বান, ফলটা সেখানে গৌণ হয়ে যায়। অসম্ভব নয় যে দু-একটি সংশোধনের আলোয় সমগ্র রচনার এক নূতন বিভা হঠাৎ দেখতে পাচ্ছি আমরা, রচনা হিসেবেই তার মূল্য কখনো-বা বেড়ে যাচ্ছে আমাদের মনে, সৃষ্টিকেই নূতন-ভাবে পাচ্ছেন তখন পাঠক। কিন্তু সেই সম্ভাবনার কথা সবসময়ে আর মনে থাকে না বড়ো, পদ্ধতির দিকে অশান্ত উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ার ফলে আমরা আজ কেবল মনে রাখি সংখ্যার কথা, আরো-একটি আরো-একটি আরো-একটি রচনা পাণ্ডুলিপি বা সংশোধনের কথা, আর তাকে নূতন পাবার উত্তেজনায় কিছু-বা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে আমাদের মন, উপায় আর উপেয়ের মধ্যে একটা বিপর্যাস ঘটে যায় তখন। পাঠক আর লেখককে দুই প্রান্তে সরিয়ে দিয়ে মাঝখানে জেগে উঠতে থাকেন শুকনো গবেষক, এই সম্ভাবনাটা তখন বেড়ে যায় খুব। আবিষ্করণীয়ের চেয়ে আবিষ্কারটা, বিষয়ের গুরুত্বের চেয়ে তার প্রকাশের গৌরবটাই অনেক বেশি মাথা তুলে দাঁড়াতে থাকে তখন। আর তারই ফলে দেখা দেয় এক প্রতি-যোগিতার, ধাবমানতার এবং গোপনীয়তার বোধ, ক্লান্তিকর এবং লজ্জাজনক।

হয়তো-বা এই বোধেরই ফলে কয়েক বছর জুড়ে একটা দুর্লক্ষণ দেখা দিচ্ছে আমাদের দেশে। অপ্রকাশিতের অভিধা নিয়ে এমন অনেক লেখাই আত্মপ্রকাশ করছে এখানে-ওখানে নানা সময়ে, যা

এক বা একাধিকবার ছাপা হয়েছে আগে, কখনো পত্রিকায় কখনো-বা কোনো বইতেই। এমন ঘটনা যদি একটি-দুটি ঘটত কখনো, তাকে মনে করা যেত বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যক্তিগত স্খলন মাত্র। কিন্তু যখন কেবলই ঘটতে থাকে এমন কাণ্ড, তখন মনে হয় এ কোনো ব্যক্তিগত সমস্যা নয় আর, এ হয়ে উঠছে প্রায় কোনো সামাজিক সংকটের মতো। মনে হয় প্রকাশের আনন্দের চেয়ে প্রচারের উত্তেজনাটাই হয়ে উঠেছে বড়ো, বিষয়ের চেয়ে বিষয়ী। যে-কোনো প্রকাশকেই একদিন ডিকিনসন ভেবেছিলেন যেন মানবমনকে কোনো নিলামে তোলার মতো, অপ্রকাশিত সেই কবির পক্ষে হয়তো ভাবা সম্ভব ছিল সেটা। 'কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস ওরে আমার গান' বলতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে কিছু-বা প্রচ্ছন্ন বেদনায়। শিল্পীদের এসব অভিমান সত্ত্বেও প্রকাশ্য হন তাঁরা, হতে চান। কিন্তু আজ সেই হাট বা নিলামের কথা যেন অনেক তাৎপর্যময় হয়ে আসে, যখন দেখি লেখার চেয়ে লেখার খবরটা অনেক বেশি জায়গা জুড়ে থাকে আমাদের মগজে, আর প্রায় যেন কোনো নেশার মধ্য দিয়ে অপ্রকাশিতের দিকে ছুটতে থাকি আমরা।

আমাদের দেশে নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই এ সমস্যা সবচেয়ে বেশি। বিস্তর তিনি লিখেছেন, আজও আছে তাঁর বিস্তর অপ্রকাশিত লেখা। কিন্তু কী সে লেখার ধরন? এমন-কিছু কি, পাঠকের কাছে যা রবীন্দ্রনাথের কোনো অভাবনীয় পরিচয় তুলে ধরতে পারে আজও? একেবারে কোনো নূতন দিগ্‌দর্শন? মনে হয়, তেমন রচনাও কিছু মিলবে তাঁর লেখা এবং তাঁকে লেখা অসংখ্য চিঠিপত্রের মধ্যে, যার প্রকাশও হয়নি সবটা এখনো, গ্রন্থায়ন হয়েছে আরো কম। যাকে বলা যায় একেবারে নূতন কোনো সৃষ্টি, জীবনানন্দের

'মাল্যবান' বা 'সুতীর্থ'র মতো ভিন্ন দিগন্তের উত্তেজনা হতে পারে যাতে, তেমন কোনো অপ্রকাশিত রচনা রবীন্দ্রনাথে আজ পাওয়া শক্ত। কিন্তু নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে তাঁর জানা-রচনার অজানা-পাণ্ডুলিপি বা পাঠান্তর অনেক, একই রচনার নানা রূপ-রূপান্তরে নিশ্চয়ই তৃপ্ত হবে আমাদের 'মোহধ্বান্তনাশন' 'সূক্ষ্মতর্কে'র মন, পাণ্ডিত্যের ছোটো একটা মহলে নিশ্চয় খুব মূল্যও হবে তার। 'মালঞ্চ' উপন্যাস পড়বার পর 'মালঞ্চ' নাট্যরূপকে যদি পাওয়া যায় হাতের সামনে, বা 'যোগাযোগ' উপন্যাসের পর 'যোগাযোগ'-এর নাট্যরূপ, অথবা উলটোভাবে 'বাঁশরি' নাটক পড়বার পর যদি পাওয়া যায় এর উপন্যাস-রূপ 'ললাটের লিখন', তা হলে আমাদের একটা খবর জানা হয় ঠিকই, সাহিত্যের সূক্ষ্মবিচারে কাজেও লাগানো যায় সেটা, কিন্তু তবু বলা যায় না 'ললাটের লিখন' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত নূতন উপন্যাস পাওয়া গেল, কিংবা 'মালঞ্চ' আর 'যোগাযোগ' নামের নূতন কোনো নাটক। যদি 'রক্তকরবী'র বহুতর পাণ্ডুলিপি থেকে জানা যায় যে নন্দিনী একদিন ছিল খঞ্জন, অথবা চন্দ্রা-ফাগুলালের সংলাপে রাজার আরো একটা পরিচয় ছিল এই যে তাঁর 'মুখের মধ্যে একজোড়া চশমার কাচ', যদি 'বিসর্জন'-এর কোনো সংস্করণ থেকে জানা যায় যে অপর্ণার সঙ্গে একদিন ছিল তার অন্ধ বাবাও, যদি জানা যায় যে 'মানসী'র পাণ্ডুলিপিতে 'কর্ল্যে, নেম্যে'র মতো বানানও ছিল একসময়ে, তা হলে আমাদের কিছু কৌতূহল তৃপ্ত হয় ঠিকই, কিন্তু এর থেকে যা পাওয়া যায় তার ব্যাপ্তি আর গভীরতা বড়ো বেশি দূর নয়, ছোটো মাপের একটা প্রাপ্তি মেলে তাতে। এরই টানে পাঠক থেকে আমরা এগিয়ে যাই আমাদের গবেষকসত্তার দিকে, বিষয়ের প্রয়োজন থেকে চলে যাই পদ্ধতির আবর্তে।

তার মানে কি তবে এই যে এগুলির প্রকাশ অবাঞ্ছনীয়? তা আমাদের মনে হয় না, চাই নিশ্চয় এদেরও প্রকাশ। কিন্তু যখন দেখি যে আমাদের দেশের নানা প্রতিষ্ঠান কেবলই বলেন তাঁদের সীমিত সাধ্যের কথা, যখন দেখি যে প্রকাশের ব্যবস্থা আর সম্ভাবনা কতই খণ্ডিত আর বাধাগ্রস্ত এখানে, তখন মনে হয় যে আমাদের মতো পাঠকদের জন্য গবেষকদের ভেবে নিতে হবে একটা পারম্পর্যের পরিকল্পনা, অগ্রাধিকারের বিচার। একই সঙ্গে সমস্ত অপ্রকাশিতের সামগ্রিক প্রকাশ সম্ভব নয় যখন, তখন গবেষক এবং সংকলকেরা কি ভাববেন না যে কোন্‌টার প্রয়োজন প্রাথমিক আর কোন্‌টার-বা দূরবর্তী? বড়ো কোনো লেখকের একই লেখাকে বারবার ছাপানোয় নিশ্চয় দোষ নেই কোনো, যদি-না তাঁর আরো জরুরি কোনো অপ্রকাশিত লেখা পড়ে থাকে আজও, যদি-না প্রকাশিত লেখাটি পাঠকের পক্ষে নিরর্থক হয় একেবারে। পাঠক যেন ভাবতে পারেন সে-লেখা পড়ে, 'এটা আমি আগে দেখিনি, এই-ই এর একমাত্র মূল্য নয়, এ আমাকে ভাববার-মতো খুশি-হবার-মতো নূতন কিছু বলছে বলেই আমার কাছে এর টান।' আর সেটা হতে পারে তখনই, যখন গবেষক ও সংকলকেরাও ভাববেন সেই আনন্দেরই কথা, যখন দূরবর্তী পাঠকদের কাছে সেই আনন্দের ভাগ পৌঁছে দেবার আগে তাঁর কাছাকাছি সহধর্মী মানুষদের সঙ্গেও কথা বলবার আর ভাবনা-বিনিময় করবার উৎসাহ হবে তাঁর। সেই বিনিময়ের মধ্য দিয়ে এমন হওয়াও অনেক সময়ে সম্ভব যে, তিনি হয়তো বুঝতে পারবেন নিতান্ত কৌতূহল জাগানো লেখাগুলিরই অগ্রাধিকার পাবার কথা নয় এই প্রকাশের ক্ষেত্রে, কিংবা হয়তো এও জানতে পারবেন যে অজ্ঞাতপূর্ব বলে যাকে ভাবছেন তিনি তা ততটাই অজানা ছিল না আগে,

হয়তো তাঁর চোখ এড়িয়ে গেছে যে এসব নিয়ে কিছু কথা হয়ে গেছে আগেও কখনো-কখনো। গবেষণা আমাদের কাছে একটা সামাজিক সোপানের মতো হয়ে উঠেছে বলেই প্রকাশ-অপ্রকাশের এই সমস্যাও হয়ে উঠছে এক সামাজিক সমস্যা, ডিকিনসনের 'Publication is the Auction/Of the Mind of Man' কথাটার একেবারে এক ভিন্ন মানে দাঁড়িয়ে গেছে এখন। 'অপ্রকাশিত' শব্দটি মোহময় ঘণ্টাধ্বনির মতো বেজে ওঠে যেন, যেন মুগ্ধ পাঠকের কাছে সেই ধ্বনিটি ছাড়া আর-কিছুরই দরকার নেই কোনো। পারম্পর্যের কথা যদি নাও ভাবেন গবেষকেরা, নাও যদি ভাবেন পণ্ডিত আর পাঠকের মধ্যে কার কাছে ঠিক পৌঁছতে চান তাঁরা, অন্তত তাঁরা ছেড়ে দিতে পারেন ছোটো ওই শব্দটার মায়া। ভালোবেসে যিনি পড়তে চান আর জানতেও চান যিনি আগ্রহ নিয়ে, তাঁর পক্ষে তো এ কথাটাই বড়ো যে 'এখানে ছাপা হলো লেখাটি'। 'প্রথম ছাপা হলো এখানে' এ কথাটা তাঁর কাছে একেবারেই অবান্তর, যদি-না তিনি নিজেকে নিয়ে আসতে চান নিলামের কোনো হাটে। তাই, অপ্রকাশিত লেখা ছাপা হোক আরো অনেক, সর্বত্রই, কিন্তু অপ্রকাশিতের লেবেলটা সরে যাক আমাদের কপাল থেকে। কেবলমাত্র তা হলেই হয়তো সাম্প্রতিক কয়েকটি অসংগতির হাত থেকে বেঁচে যেতে পারি আমরা, বেঁচে যেতে পারি কিছু অসমীচীন প্রতিযোগিতার দায় থেকে।

'বিকেলবেলা ত্রিবেদী মহাশয়ের ঘরে অধ্যাপকদের আড্ডা জমত কৃষ্ণকমলবাবুকে ঘিরে। সেখানে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, সাহিত্য, চারুকলা, পুরাতন ইতিহাসের আলোচনা হতো, আমি পাশে দাঁড়িয়ে শুনতাম। এমন আলোচনা আর কোথাও আমি অন্তত শুনিনি।' এ অভিজ্ঞতা ধূর্জটিপ্রসাদের, যখন তিনি রিপন কলেজের ছাত্র ছিলেন। সেই হয়তো শেষ যুগ, তার পর থেকে ধীরে ধীরে চিন্তার জগতে শ্রমবিভাগের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। বাংলা যে প্রবন্ধ-সম্ভারের শুরু হয়েছিল অক্ষয়কুমারের বিচিত্র জিজ্ঞাসায়, তার সম্পূর্ণ বিকাশ দেখতে পাই শতাব্দীর শেষার্ধে। কিন্তু আজকের দিনে আমরা বিশেষ-বিষয়ের পাণ্ডিত্যে প্রখর মনীষীদের নাম যদি-বা করতে পারি, এমন উদাহরণের উচ্চারণ নিতান্ত কঠিন হয়ে পড়ে যাঁর মধ্যে চিন্তার সেই সর্বৈব অন্বেষা প্রবল, যে-আলোচনাচক্রে 'তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, সাহিত্য, চারুকলা, পুরাতন ইতিহাসে'র একত্র-চর্চা সম্ভব।

উপরন্তু সংস্কৃতশিক্ষা এখন প্রায় অপাঙ্‌ক্তেয়। আমাদের প্রত্যেক মুহূর্ত ক্ষণভঙ্গুর বর্তমানের মধ্যে লুটোপুটি করে, অথবা সাংস্কৃতিক উৎসের খোঁজে আজ আমরা বার বার উনবিংশ শতকের মুখের দিকে তাকাই। কিন্তু বিগত সেই শতাব্দী তাকিয়ে ছিল গোটা প্রাচীন ভারতের দিকে আর 'বর্তমানকে জানার সবচেয়ে ভালো উপায় অতীতকে জানা' এই বিশ্বাসে সমগ্র অতীতের মন্থন

সম্ভব হয়েছিল ইংরেজিশিক্ষিত আধুনিকদের চর্চায়। ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্রের ঋগ্বেদ-অনুবাদ ছিল সেই বিরাট প্রাণস্পন্দনের এক প্রকাশ। জীবনপ্রভাত ও জীবনসন্ধ্যার রচয়িতা রমেশচন্দ্রের আড়ালে তাঁর ঐ পরিচয় আজ প্রচ্ছন্ন। 'বঙ্গদর্শন', 'প্রচার' এবং 'নবজীবন' পত্রিকায় তখন বঙ্কিম, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র—এঁদের সমবেত রচনার মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতের যে নবীন জাগরণ, তা ছিল বিশেষ তাৎপর্যময়। শশধর তর্কচূড়ামণির হাস্যজনক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অথবা চন্দ্রনাথ বসুর হিন্দুয়ানি এ নয়, এর মূল্য ছিল মুক্তদৃষ্টির।

বাংলাদেশে বেদচর্চার অভাব প্রথম লক্ষ করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশের দু-এক বছর পরেই তিনি চতুর্বেদ অধ্যয়নের জন্য চতুর্ব্রাহ্মণকে কাশীতে পাঠান, রমানাথ ভট্টাচার্য তার অন্যতম। 'তত্ত্ববোধিনী'তে ঋগ্বেদের অনুবাদও প্রকাশিত হতে থাকে, তাঁরই রচিত, এবং রমানাথ সরস্বতীও সে-কাজে খানিকটা এগিয়েছিলেন। এর কোনোটিই সম্পূর্ণ হতে পারেনি। ফলে 'ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি সরল, সুন্দর ও প্রকৃতির আলোকে আলোকপূর্ণ, জগতের আর্যজাতিদিগের মধ্যে কেবল কি আমরাই এই অপূর্ব রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিব?'—রমেশচন্দ্রের এই আক্ষেপোক্তি স্বাভাবিক মনে হয়। এ অনুবাদের কাজে তিনি স্বয়ং যখন আকৃষ্ট হয়েছেন সে-সময়ের মধ্যে মারাঠি, ইংরেজি, জার্মান ও ফরাসি ভাষায় তার কিছু-কিছু অনুবাদ প্রকাশিত হয়ে গেছে। এই আংশিক অনুবাদগুলি এবং ইওরোপীয় বেদজ্ঞদের সমকালীন ধারণাবলীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তিনি। কতদূর পর্যন্ত তাঁর নিষ্ঠা ছিল তা বুঝতে পারি চতুর্থ খণ্ডের ভূমিকা লক্ষ করলে। ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত

গ্রাসমান এবং লুড্‌ভিক্‌-এর জার্মান দুটি সম্পূর্ণ অনুবাদের সংবাদও রাখতেন তিনি এবং এর মধ্যে অন্তত একখানি তিনি সংগ্রহ করেও নিয়েছিলেন। লাঁগ্লোয়ার ফরাসি অনুবাদ, ম্যাক্সমূলর, উইলসন, রট্, মূর, কাওয়েল, বেনফে, রোসেন, হেবস্টারগার্দ—এঁদের সকলের আলোচনা বা আংশিক অনুবাদ আয়ত্তে ছিল তাঁর। ফলে রমেশচন্দ্র যখন ঋগ্বেদ অনুবাদে আত্মনিয়োগ করলেন, মানসিক দিক থেকে তখন তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

এ কথা ঠিক যে সায়ণের টীকাই তাঁর মূল অবলম্বন এবং রামগতি স্থায়রত্ন বা বঙ্কিম অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করেছেন এই দেখে যে রমেশ-চন্দ্রের অনুবাদ সম্পূর্ণ সায়ণ-নির্ভর। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের লক্ষ করা উচিত হবে যে এই তৃপ্তি রমেশচন্দ্রের সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। বঙ্কিমের উক্তিমতো রমেশচন্দ্র যে 'সর্বত্র'ই সায়ণ মেনে নিয়েছেন তা হয়তো সত্যি নয়। পাদটীকায় যোজিত তাঁর দীর্ঘ মন্তব্য ও তুলনা-মূলক আলোচনাগুলি লক্ষ করলেই বুঝতে পারব প্রয়োজনমতো সায়ণের ব্যাখ্যা ও শব্দটীকা অগ্রাহ্য করতে আধুনিক এই অনুবাদক কিছুমাত্র দ্বিধা করেননি। যে-তীব্রতায় বঙ্কিম ম্যাক্সমূলর-প্রমুখ ইওরোপীয় ভারতজ্ঞদের আক্রমণ করেছেন (যেমন তাঁর হেনোথীজ্‌ম্ তত্ত্ব প্রসঙ্গে) রমেশচন্দ্র ঠিক সে-জাতীয় বিমুখতায় কখনোই দেননি তাঁদের সরিয়ে—এক হিসেবে এ হয়তো তাঁর ঔদার্যই। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব এবং সায়ণ-নির্দেশিত ঐতিহ্যনির্ভরতা, এ-দুয়ের যে মধ্যপন্থাসমন্বয় পরবর্তীকালে ক্রমে গড়ে উঠেছে—রমেশচন্দ্র অস্পষ্টভাবে তারই অভিমুখী ছিলেন, এই রকম মনে হয়।

উনিশ শতকের শেষ দুই দশক ভারতচর্চার এক গৌরবময় সময়। রমেশচন্দ্রের অনুবাদ প্রকাশিত হবার কিছু আগে থেকেই

বঙ্কিম 'প্রচার' পত্রিকায় বেদ-বিষয়ক প্রবন্ধরচনায় আগ্রহী হন এবং পর-পর তাঁর বেশ-কয়েকটি প্রবন্ধ সেখানে পেয়ে যাই আমরা। রমেশচন্দ্রের এই অনুবাদে উল্লসিত হয়ে ওঠা বঙ্কিমের পক্ষে তাই স্বাভাবিক ছিল। অনুবাদকে স্বাগত জানিয়ে তিনি লিখেছিলেন : 'যেমন বাইবেলের অনুবাদে ইউরোপ উপধর্ম হইতে মুক্ত হইল, ইউরোপীয় উন্নতির পথ অনর্গল হইল, রমেশবাবুর এই অনুবাদে এদেশে তদ্রূপ সুফল ফলিবে।' পুরোহিত সম্প্রদায়ের খড়্গহস্ত হয়ে ওঠার যে-উল্লেখ বঙ্কিম করেছেন তাও স্বাভাবিক, বিশেষত রমেশচন্দ্র অব্রাহ্মণ, তবে সে-উত্তেজনা তো শতাব্দী-সূচনায় রাম-মোহনের শাস্ত্রচর্চা থেকেই অনুসৃত! কিন্তু এ অনুবাদ জাতীয় চিত্তে বাইবেলের মতো প্রভাব বিস্তার করবে, এ হয়তো বঙ্কিমের অতি-আশা। অন্তত সাধারণ পাঠকচিত্তের সঙ্গে এর কোনো ধারাবাহিক সংযোগ রচিত হতে পারেনি। আধুনিক ভারতে, বিশেষত বাংলায়, বেদচর্চার পরিণতি কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে? গত বৎসর দিল্লীতে সর্বভারতীয় বেদজ্ঞদের এক সম্মেলন পরম হতাশার সঙ্গে শাস্ত্রচর্চার এই ক্ষীয়মাণতা লক্ষ করেছিল এবং একে রোধ করবার জন্য কয়েকটি কৃত্রিম অনুশাসনের প্রস্তাবও নিয়েছিল। রমেশচন্দ্রের এই অনুবাদ গ্রন্থ আজ যদি প্রায় অপরিচিত হয়ে গিয়ে থাকে, তবে উপরোক্ত অবস্থার সঙ্গে তা নিতান্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেই মনে হয়।

নিছক ভারতচর্চার দিক থেকে রমেশচন্দ্রের এই অনুবাদকৃতিটি স্মরণীয়। কিন্তু তার সঙ্গে আবার লক্ষ করি এর শিল্পগুণও। অনুবাদক তাঁর ভূমিকায় ঋগ্বেদের ধর্মচিন্তাকেই শুধু প্রশ্রয় দেননি, 'প্রকৃতির আলোকে আলোকপূর্ণ' সুন্দর সরল মন্ত্রগুলিরও উল্লেখ করেছেন। আর, লেখাগুলি পড়তে পড়তে আমরা বুঝতে পারি,

রমেশচন্দ্র কী কৌশলে এই আলোকবিভা তাঁর অনুবাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন।

সমকালীন দু-একটি অনুবাদ-অংশের সঙ্গে তুলনা করে দেখলে হয়তো এই শিল্পগুরুত্ব আমরা বুঝতে পারব। এই হলো বঙ্কিমের একটি রচনাংশ: 'অগ্নি পূর্ব-ঋষিদিগের দ্বারা স্তুত হইয়াছেন এবং নূতনের দ্বারাও। তিনি দেবতাদিগকে এখানে বহন করুন।' এর সঙ্গে তুলনা করা যাক ঐ অংশের রমেশচন্দ্রকৃত অনুবাদ: 'অগ্নি পূর্বঋষিদিগের স্তুতিভাজন ছিলেন, নূতন ঋষিদিগেরও স্তুতিভাজন; তিনি দেবগণকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুন।' শ্রী আর স্বাভাবিকতায় পরবর্তীটি পূর্বতনকে কি অতিক্রম করেনি? অথবা, রমানাথ সরস্বতীর একটি শ্লোকানুবাদ: 'অবিশ্রান্ত প্রবহণশীল নদী-সকলের জলমধ্যে বৃত্রাসুরের দেহ পতিত হইল। জলসমূহ বন্ধনমুক্ত হইয়া অন্তর্হিত বৃত্রদেহের উপর প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইন্দ্রদেবের সহিত শত্রুতা করিয়া বৃত্রাসুর চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইল।' এর সঙ্গে রমেশচন্দ্র: 'স্থিতিরহিত, বিশ্রামরহিত জলের মধ্যে নিহিত, নামশূন্য শরীরের উপর দিয়া জল বহিয়া যাইতেছে; ইন্দ্রশত্রু দীর্ঘ-নিদ্রায় পতিত রহিয়াছে।' এ-অনুবাদ স্বাভাবিকের চেয়ে আরো একটু বেশি, যথার্থ পাঠে এর অন্তঃপ্রবাহী ছন্দস্রোত পর্যন্ত লক্ষ করা যায়। বস্তুত, এই অনতিগোচর ছন্দই তাঁর অনুবাদকে কাব্য-বিভান্বিত করে তুলেছিল।

২

মূল্যবান এই অনুবাদগ্রন্থটি এখন দুষ্প্রাপ্য, এমন-কী, সাধারণের অগোচর। তাই দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও মণি চক্রবর্তীর সম্পাদনায় এর পুনঃপ্রকাশ এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় স্বভাবত গবেষক। বিশেষত গত কয়েক বছর যে Indian Studies সম্পাদনা করছেন তিনি, তার মধ্য থেকে তাঁর অতীতসন্ধানী মনটির পরিচয় পাওয়া যায়। অনুমান করা কঠিন নয় যে আলোচ্য সংস্করণটির পরিকল্পনাও তাঁর মনে এসেছে ঐ অতীত-সূত্রের আলোচনাক্রমে। Indian Studies-এর খণ্ডগুলির মধ্যে একাধিক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ যেমন সম্ভব হয়েছে, রমেশচন্দ্রের এ অনুবাদটিও তেমনি একই মনোভঙ্গি থেকে সকলের হাতে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন তিনি। সাধারণ পাঠক এজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করবে।

এক অর্থে, একে অবশ্য মাত্র-পুনর্মুদ্রণ বলা চলে না। রমেশচন্দ্রের অনুবাদ অংশকে সম্পূর্ণ যথাযথ রেখেও এখানে অন্যরকম কয়েকটি পরিবর্ধন করা হয়েছে। সম্পাদকের ভাষায়: 'রমেশচন্দ্রের অনুবাদ গদ্যে বলেই সূক্তগুলিকে গদ্যাকারে মুদ্রিত করায় বাধা হয়নি। সূক্তের অন্তর্ভুক্ত প্রতি ঋকের 'শেষে' ঋক্ সংখ্যা নির্দিষ্ট হয়েছে। প্রতি পৃষ্ঠার শীর্ষে সেই পৃষ্ঠায় মুদ্রিত শেষ ঋক্ মণ্ডল বিভাগ অনুসারে নির্দিষ্ট হয়েছে। প্রতি সূক্তের শীর্ষে দেবতা, ঋষি ও ছন্দ বিশেষভাবে সংযোজিত হয়েছে।'

শেষ উল্লেখটি সবচেয়ে লক্ষণীয়। বঙ্কিম তাঁর আলোচনায় লিখেছিলেন: '…প্রথম ঋক্ উদ্ধৃত করিতেছি। কিন্তু উহার একটি হেডিং আছে। আগে হেডিংটি উদ্ধৃত করি। ঋষিবিশ্বামিত্র-পুত্রো মধুচ্ছন্দা। অগ্নির্দেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। ব্রহ্মযজ্ঞান্তে বিনিয়োগঃ অগ্নিষ্টোমে।চ।' এই হেডিং-এর মধ্যে চারটি বিষয়ের উল্লেখ পাই, ঋষি বা কবির নাম, উদ্দিষ্ট দেবতার নাম, ছন্দনাম এবং প্রয়োগনাম। রমেশচন্দ্রের অনুবাদে প্রতিটি সূক্তের সঙ্গে

ঋষিনাম ও দেবতানাম দেওয়া আছে, কিন্তু ছন্দ ও বিনিয়োগ বর্জিত। বিনিয়োগগুলি প্রায়ই আরোপিত ও কষ্টকল্পিত বলে তার বর্জন হয়তো সমীচীন, সাম্প্রতিক সংস্করণেও তার ব্যবহার নেই। কিন্তু ছন্দনাম রমেশচন্দ্র কেন বর্জন করলেন? দেবীপ্রসাদ অনুমান করেন, অনুবাদ গদ্যে বলেই তিনি ছন্দের কথা ভাবেননি। তা সম্ভব। কিন্তু ঋক্‌গুলির পূর্ণ পরিচয়ের জন্য ছন্দনাম যুক্ত করার প্রয়োজন ছিল, সম্পাদকেরা তা বুঝেছেন।

সবচেয়ে শ্রমসাধ্য সম্পাদকীয় কাজ হলো সূক্তশীর্ষে ঋষি ও দেব -নামের পূর্ণতাদানে। ঋগ্বেদের একেকটি সূক্তে একাধিক দেব উদ্দিষ্ট এবং একাধিক ঋষির দ্বারা স্তুত, এমন উদাহরণ সুলভ। রমেশচন্দ্র তাঁর কাজ খানিকটা সহজ করে নিয়েছিলেন। সূক্তে প্রথমোক্ত দেব বা ঋষির নামই তিনি ব্যবহার করেছেন। বর্তমান সম্পাদনায়, ঋক্‌-সংখ্যা উল্লেখ করে বিভিন্ন দেবতা, ঋষি ও ছন্দের নাম প্রতি সূক্তশীর্ষে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ কাজ যে কত দুরূহ, দু-একটি উদাহরণ বিশ্লেষণ করলে তা বোঝা যায়। ১/১৩ সূক্তে বারোটি ঋক্‌-এ বারোজন দেবতা উল্লিখিত, ৬/৭৫ সূক্তে উনিশটি ঋকে তেইশজন দেবতা। ৫/৪৪ সূক্তে পনেরোটি ঋক্‌, ঋষির সংখ্যা তেরো। ১/১২০ সূক্তে বারোটি ঋক্‌, ন-রকম ছন্দ, ৮/৪৬ সূক্তে তেত্রিশটি ঋক্‌-এ দশ রকম ছন্দ এবং আরো উপবিভাগ। সমগ্র ঋগ্বেদের ১০২৮টী সূক্তকে এইভাবে পুনর্বিন্যস্ত করা করা কী পরিশ্রমের, তা সহজেই অনুমান করতে পারি।

বেদপাঠের পরিচায়িকা হিসেবে সম্পাদকীয় ভূমিকাটি পরিচ্ছন্ন এবং উপযোগী। চব্বিশ পৃষ্ঠার এই সংহত রচনাটির মধ্যে 'সাধারণ পাঠকের বেদপরিচিতি'র প্রাথমিক প্রয়োজন সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়। বেদ

ও বৈদিক সাহিত্য, ঋগ্বেদসংহিতা, বৈদিকছন্দ, সামবেদসংহিতা, যজুর্বেদসংহিতা, অথর্ববেদসংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ, বেদাঙ্গ, বেদের কালনির্ণয়—এই দশটি অংশে ভূমিকাটি লিখিত। বেদের কালনির্ণয় প্রসঙ্গে সম্পাদক স্বয়ং কোনো আলোচনা করেন নি, কেননা এই প্রসঙ্গে আচার্য সুনীতিকুমারের দীর্ঘ একটি আলোচনা এখানে গৃহীত। কিন্তু জ্ঞাতব্য তথ্যাবলীতে অন্যান্য বিভাগগুলি ভরে আছে। ঋগ্বেদপরিচয় অংশে সংহিতাপাঠ, পদপাঠ, ক্রমপাঠ, জটাপাঠের বিশ্লেষণ বস্তুতই আধুনিক পাঠকের পক্ষে চিত্তাকর্ষক এবং ছন্দ-প্রসঙ্গের আলোচনাও বিশেষ লক্ষণীয়। অল্প পরিসরে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়কে মিলিয়ে নিয়ে এ জাতীয় আলোচনা খুব সুলভ নয়, এদিক থেকে এই ভূমিকাটি মূল্যবান।

আরো কয়েকটি রচনা ব্যবহৃত হয়েছে বর্তমান সংস্করণে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বৈদিকসাহিত্য, তার কালপরিচয় এবং বেদচর্চার ইতিহাস প্রসঙ্গে দীর্ঘ একটি আলোচনা করেছেন। শশিভূষণ দাশগুপ্ত রমেশচন্দ্রের সাহিত্যকৃতি বিষয়ে পরিচায়িকা লিখেছেন। প্রবোধরাম চক্রবর্তী একটি তালিকা প্রস্তুত করে দিয়েছেন রমেশচন্দ্রের রচনাবলীর। এ ছাড়া, বৈদিক ভারতের একটি মানচিত্র সঙ্গে যুক্ত থাকায় সম্পাদকীয় আয়োজন পরিপূর্ণ হয়েছে বলা যায়।

বৈদিকযুগ সম্পর্কে রমেশচন্দ্রকালীন ধারণাবলীর আরো অনেকটা পরিবর্তন হয়ে গেছে আজ। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব বা সর্বপ্রাচীনত্ব নিয়ে যে গর্ববোধ উনিশ শতকে আমরা অবিরাম দেখেছি এখন তা অনেকটা অপসৃত হবার কথা। মিতান্নি আর্যভাষা বা হিট্টিভাষার আবিষ্কারেই বৈদিকভাষার সর্বপ্রাচীনত্ব আর গ্রাহ্য হয় না। এরও ওপর, গত দশ বছরের মধ্যে দুজন ইংরেজ

প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ করেছেন যে প্রাচীনতম গ্রীকভাষার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে ১৪০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দের। ফলে সে-ভাষাকেই এখন প্রাচীনতম বলতে হবে। এই বিষয়টির উল্লেখ, বেদের কাল বিষয়ে বিস্তৃত মীমাংসা, ভাষা ছন্দ ও উচ্চারণের প্রসঙ্গ: সমস্ত নিয়ে আচার্য সুনীতিকুমারের রচনাটি বিশেষ আকর্ষণের বিষয়। ভাষাগত বিবর্তন দেখাবার জন্য রবীন্দ্রনাথের একটি লাইনের কাল্পনিক স্তর-পরম্পরা লেখক এখানে ব্যবহার করেছেন। অবশ্য ওটি তাঁর প্রায় তিরিশ বছরের পুরোনো রচনাংশ, ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক তাঁর প্রাথমিক বইটিতে অথবা তাঁর ব্যাকরণেও ছোটোবেলায় পড়তাম আমরা।

ডক্টর দাশগুপ্তের রচনাটির শেষ দিকে একটি অন্যমনস্ক প্রয়োগ চোখে পড়ে। 'সমস্ত মন্ত্রগুলির অর্থ একত্রিত করিয়া গোটা ঋক্‌টি অর্থবান্ হইয়া ওঠে'—ঋক্ নয়, এখানে তিনি সূক্ত কথাটি ব্যবহার করতে চেয়েছেন নিশ্চয়ই। প্রবোধরাম চক্রবর্তী -কৃত গ্রন্থপঞ্জীটির দিকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করলে বোঝা যায় লেখক হিসেবে রমেশ-চন্দ্রের উৎসাহ কতদিকে ব্যাপ্ত ছিল। দেশচেতনা ও ইতিহাসবোধ সেই উৎসাহের প্রধান অংশ, সমস্ত রচনাবলীর পটভূমিতেই ঐ বোধ প্রচ্ছন্ন।

এই তালিকাটি প্রসঙ্গে একটি কৌতূহলজনক তথ্যের উল্লেখ করা যায়। ঋগ্বেদসংহিতার প্রকাশকাল বলা আছে ১৮৮৫-৮৭। এক্ষেত্রে মনে রাখা ভালো, ভিন্ন ভিন্ন বিন্যস্ত অষ্টকগুলির ভূমিকা-রচনাকাল মূলত ছিল এইরকম: ১ আশ্বিন ১২৯২, ১ মাঘ ১২৯২, ১ চৈত্র ১২৯২, ১ বৈশাখ ১২৯৩, 3rd May 1886, 11th May 1886, 20th May 1886, এবং 26th May 1886। একমাত্র অষ্টম খণ্ডটি ছাড়া সবকটির নামপত্রে ১৮৮৫ এবং ১৮৮৬ আছে।

এই তারিখ লক্ষ করলে বুঝতে পারি কী অসামান্য দ্রুততায় খণ্ডগুলি প্রকাশের জন্য দেওয়া হয়েছে। আরো বিস্ময়ের বিষয়, শেষ চারটি খণ্ড মুদ্রণকালে অনুবাদক আছেন বিদেশগামী এক জাহাজে, সেখান থেকে বশিষ্ঠের একটি স্তব ব্যবহার করে লিখছেন: 'সমুদ্রমধ্যে নৌকা সুন্দররূপে প্রেরণ করিয়াছি, জলের উপর গমনশীল নৌকায় আছি, শোভার্থ দোলায় সুখে ক্রীড়া করিতেছি।'

৩

বিরাট এই অনুবাদ-বইটি নতুনভাবে প্রকাশের আয়োজন করে সম্পাদক-দুজন আমাদের মতো সাধারণ পাঠকের অকুণ্ঠ সাধুবাদ অর্জন করবেন সন্দেহ নেই। কিন্তু ঐ সঙ্গে উল্লেখ করা ভালো যে বিশেষ কৌতূহলী কোনো কোনো পাঠক এ সংস্করণে দু-একটি ঐতিহাসিক অভাব বোধ করতে পারেন।

বর্তমান মুদ্রণে সম্পূর্ণ নির্ভর করা হয়েছে রমেশচন্দ্র-কৃত দ্বিতীয় সংস্করণের ওপর। অনুবাদক স্বয়ং সেই সংস্করণ প্রস্তুত করেছিলেন, তাই এর যুক্তি আছে। কিন্তু আজ যখন ঋগ্বেদসংহিতার বঙ্গানুবাদ আমাদের হাতে পৌঁছবে তখন তার আকর্ষণ হবে উভয়ত। বেদ-চর্চার স্বতন্ত্র মূল্য একদিকে, অন্যদিকে রমেশচন্দ্রের সৃষ্টিকর্ম হিসেবেও এর তাৎপর্য লক্ষ করা আজ স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে অন্য দু-একটি সমস্যা দেখা দেয়। প্রথম সংস্করণকে কি একেবারে উপেক্ষা করা ঠিক হবে এখানে? মনে হয় যে, দুই সংস্করণ মিলিয়ে নিয়েই এ-সংকলন প্রস্তুত হয়েছে, কিন্তু প্রথম সংস্করণের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এখানে বর্জিত দেখতে পাচ্ছি।

১. প্রথম সংস্করণের যে ভূমিকাটি দ্বিতীয় সংস্করণে ব্যবহার করা

হয়েছে, তা প্রথম অষ্টকের ভূমিকা মাত্র। আলোচ্য পুনর্মুদ্রণেও যে নামপত্র ছাপা হয়েছে তাতে সকলে দেখতে পাবেন, ওটি প্রথম অষ্টকের। প্রথম প্রকাশের সময়ে রমেশচন্দ্রের এই অনুবাদ ভিন্ন ভিন্ন অষ্টকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বেরিয়েছিল। এইভাবে আটটি অষ্টকে আটটি ভূমিকা মূলে পাই। পরবর্তী ভূমিকাগুলি ছোটো। কিন্তু সম্পাদকেরা সেগুলি যদি পরিশিষ্টে যোগ করে দিতেন! এর ঐতিহাসিক মূল্য নিশ্চয় অস্বীকার করা যায় না। এমন-কী, এমনিতে-খুব-সাধারণ ঐ ভূমিকাকটিতে দু-একটি ভারি কৌতূহলপ্রদ খবরও পাওয়া যাচ্ছে। যেমন একটি : 'প্রথম অষ্টকের ভূমিকায় আমি লিখিয়াছিলাম যে লাংলোয়া-কৃত ফরাসি অনুবাদ ভিন্ন ঋগ্বেদসংহিতার সম্পূর্ণ অনুবাদ আর কোনও ভাষায় নাই। ঋগ্বেদ-সংহিতা জার্মান ভাষায়ও সম্পূর্ণ অনুবাদিত হইয়াছে তাহা তখন আমি জানিতাম না। লড্‌উইগ্‌ এবং গ্রাসমান এই দুইজন জার্মান পণ্ডিত অনুমান দশ বৎসর হইল ঋগ্বেদসংহিতার দুইখানি উৎকৃষ্ট অনুবাদ জার্মান ভাষায় প্রচার করেন। তাঁরা উভয়েই সায়ণের টীকা অবলম্বন না করিয়াই এই অনুবাদ করিয়াছেন। গ্রাসমান-কৃত অনুবাদখানি আমি সংগ্রহ করিয়াছি, লড্‌উইগ্‌-কৃত অনুবাদখানিও অচিরে সংগ্রহ করিবার অভিলাষ আছে।' এই ভূমিকাংশটুকুর মূল্য যে কতখানি, তা নিশ্চয় ব্যাখ্যা করে বলবার অপেক্ষা রাখে না।

২. রমেশচন্দ্রের যে কৃতিত্বে আমাদের বিস্ময়, তা কেবল এই নয় যে কী অসীম ধৈর্যে এ অনুবাদ তিনি করেছিলেন। ওরই সঙ্গে সঙ্গে যে পাদটীকা যোজনা করে গেছেন তিনি, তার আকর্ষণও কম নয়। সন্দেহ নেই যে রমেশচন্দ্রের পর আরও নতুন ব্যাখ্যার

সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, এখন তাঁর অনেক উক্তি অব্যবহার্য বা নিষ্প্রয়োজন মনে হতে পারে। কিন্তু সেই কারণেই এই টীকাগুলি বর্জিত হতে পারে না। কেননা ওর মধ্যে রমেশচন্দ্রের পঠন, পরিশ্রম, তুলনামূলক বিচার এবং ঔদার্যের যে পরিচয় ধরা আছে তা অসামান্য। যেমন, একটি দীর্ঘ উদাহরণ নেওয়া যাক, ১।৭।৯ ঋকের টীকায় : 'পঞ্চক্ষিতি অর্থ চারি জাতি ও নিষাদেরা সায়ণ এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য স্থানে পঞ্চক্ষিতি বা পঞ্চজন এইরূপ শব্দের সায়ণ ও যাস্ক অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন, পাঠক তাহা সেই সেই স্থানে দেখিবেন। কোথাও পঞ্চজগৎ বা গন্ধর্বাদি পাঁচপ্রকার জীব অর্থ করিয়াছেন ; ৮৯ সূক্তের ১০ ঋক্ ও ১০০ সূক্তের ১১ ঋক্ দেখ। সুতরাং সায়ণ পঞ্চক্ষিতি বা পঞ্চজন শব্দের প্রকৃত অর্থ না জানিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অনুভব করিয়াছেন তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। চারিজাতি ও নিষাদ—এরূপ অর্থ নহে, কেননা ঋগ্বেদরচনার প্রারম্ভে চারিজাতি ছিল না, কেবলমাত্র দুই জাতি ছিল, আর্য এবং অনার্য বা দস্যু। ঋগ্বেদ রচনাকালের শেষে আর্যদিগের মধ্যে ঋত্বিক বা পুরোহিত শ্রেণী, রাজপুরুষগণ ও সাধারণ শ্রমজীবী বা ব্যবসায়ী লোক এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী হইয়াছিল, কিন্তু তখনও এই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিস্থ লোকদিগের মধ্যে আহারাদি বা বিবাহাদি কার্য নিষিদ্ধ হয় নাই, সুতরাং এ তিনটি শ্রেণী তিনটি জাতি হয় নাই। পঞ্চক্ষিতি সম্বন্ধে পণ্ডিত রমানাথ সরস্বতী এইরূপ লিখিয়াছেন··' অতঃপর রমানাথ সরস্বতীর উদ্ধৃতি, মুর-এর Sanscrit Texts-এর উল্লেখ, ম্যাক্সমূলর ও ওয়েবারের বিস্তৃত মতামত। অথবা, এই ধরনের টীকা : 'দ্বিতীয় অসুর শব্দ দশবার ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—'

তার বিবরণ ও ভিন্ন ভিন্ন অর্থ নির্দেশ। পরবর্তী বেদচর্চায় এর মূল্য যাই হোক, এ-সমস্ত টীকা রমেশচন্দ্রের চিন্তাধরনকে বুঝতে নিশ্চয় বিশেষ সাহায্য করবে।

৩. প্রথম অষ্টকের ভূমিকায় অনুবাদক লিখেছেন : 'ঋগ্বেদ হইতে আর্যজাতিদিগের প্রাচীন ধর্ম ও ইতিহাস কতদূর জানা যায়, আমাদিগের বর্তমান হিন্দুধর্ম কিরূপে ঋগ্বেদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ঋগ্বেদের দেবগণের প্রথম অর্থ কি এবং ঋগ্বেদের রচনার সময়ে আর্য হিন্দুদিগের কিরূপ আচার ব্যবহার ছিল…সে বিষয়ে একটি পৃথক বিবরণ লিখিতে গেলে একখানি পুস্তক হইয়া পড়ে।' 'পুস্তক' রূপ এ রচনা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি বটে, কিন্তু 'নবজীবন' পত্রিকায় দীর্ঘ একবৎসরব্যাপী প্রবন্ধে এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছিলেন রমেশচন্দ্র। 'ঋগ্বেদের দেবগণ' নামক সেই সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি সাম্প্রতিক সংস্করণের মুখবন্ধ হিসেবে ব্যবহৃত হলে কেমন হতো? সুরচিত সম্পাদকীয় ভূমিকাটি ছাড়াও আরো কয়েকটি লেখা এর অন্তর্গত হয়েছে বলেই এ প্রশ্ন মনে উঠছে। এমন-কী, ঐতিহাসিক কৌতূহলের দিক থেকে বিচার করলে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বেদ' নামের রচনাটিও এর একটি উপযুক্ত পাঠ-ভূমিকা হতো কিনা, বিবেচ্য।

৪. দেব এবং ঋষি নামের একটি অনুক্রমণিকায় এ সংকলন হয়তো সমৃদ্ধতর হতো। এ কাজ বিশেষ শ্রমসাধ্য, কিন্তু শ্রমনিষ্ঠ শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের কাছে আমরা তা দাবি করতে পারি। রমেশচন্দ্র একরকম আংশিক অনুক্রম অবশ্য রেখেছিলেন। দেবতা অথবা অন্যান্য বিষয়ের বিশেষ বিবরণ, এই শিরোনামে ছোটো ছোটো কয়েকটি তালিকা তাঁর গ্রন্থান্তর্গত ছিল। অবশ্য, সে-তালিকাগুলি

অনুবাদকের টীকাপ্রসঙ্গকে জড়িত করে নিয়ে, তাই তার থেকে সম্পূর্ণ সাহায্য পাওয়া সম্পাদকদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

এই মন্তব্যগুলি কয়েকটি প্রস্তাব মাত্র, এর দ্বারা বর্তমান সংস্করণের গৌরব লঘু হয় না। আচার্য সুনীতিকুমার ভূমিকায় যে আশা প্রকাশ করেছেন, সেখানেই এর যথার্থ মূল্য : 'এই নবীন সংস্করণ দ্বারা এখন বহু বৎসর ধরিয়া বঙ্গভাষী পাঠকদের পক্ষে ভারতের সংস্কৃতি ও ধর্মের মূল উৎস আলোচনা করিবার সুযোগ আবার আসিয়াছে।' তবে, এই সুযোগের ব্যবহার আমরা কতটা করতে পারব, তা নিশ্চয় নির্ভর করছে আমাদের আকাঙ্ক্ষার প্রকৃতির উপর।

কীভাবে তাঁর সমালোচনা করা সংগত, এর একটা হদিস রবীন্দ্রনাথ নিজেই একবার দিয়েছিলেন তাঁর সত্তর বছর বয়সে। হেমন্তবালা দেবীকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন যে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভিতটা হলো ইওরোপীয়; বলেছিলেন, 'তার গল্প তার কাব্য তার নাটক প্রাচীন রীতির আশ্রয়ে তৈরি হয়নি—সেই কারণেই ইওরোপীয় সাহিত্যবিচারের আদর্শে তাকে বিচার করা ছাড়া অন্য পন্থা নেই।'

এই মন্তব্যকে পরম বলে গণ্য করবার অবশ্য কোনো কারণ নেই, বোঝাই যায় যে এর পিছনে ছিল কোনো তাৎক্ষণিক উত্তেজনা; বাংলা সাহিত্যের চলনে ইওরোপীয় ছাঁদ অনেকটা দেখা গেলেও এটা মানতে হয় যে তার একটা দেশীয় ভিত্তি ছিল, অন্তত রবীন্দ্রনাথের রচনায়। মানতে হয় যে রবীন্দ্রনাথ সেই দেশীয় জীবনভাবনার উত্তর-সাধক হিসেবে নিজেকে দেখাতেও চেয়েছেন বারবার, যখনই তিনি গেছেন বিদেশে। এই একটা মজার ব্যাপার লক্ষ করবার আছে যে এদেশের মানুষের কাছে প্রায়ই তিনি চিহ্নিত করতে চেয়েছেন তাঁর 'বেগানা' বিদেশীয় রূপ, আর প্রবাসে তিনি কেবলই জাগিয়ে রাখতে চান তাঁর অটুট ভারতীয় সত্তা। রবীন্দ্রনাথের পাঠকমাত্রেরই আজ জানবার কথা যে এই দুই পরিচয়ের সামঞ্জস্য করতে করতেই তাঁর গোটা জীবন কাটল।

কিন্তু সামঞ্জস্যের এই সাধনাটা তেমন করে সকলের চোখে

পড়ে না হয়তো, তাই কেউ-বা এর এদিকটা কেউ-বা ওদিকটায় ঝোঁক দিয়ে কথা বলেন, বিচারবিভ্রাটও ঘটতে থাকে অনেক সময়ে। 'I cannot mock thy Yes with No' কবিতার লাইনে যখন রবীন্দ্রনাথের এই প্রশস্তি লেখেন স্টার্জ মুর, কিংবা রমঁ্যা রোলাঁ যখন ভেবেছিলেন যে 'He recoiled from everything that stands for No,' তখন তাঁরা এই অস্তিনির্ভরতাকে ধরে নেন ভারতীয় একটি বিন্যাস মাত্র, রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে তাঁরা তখন ভারতবর্ষকেই দেখতে পান আর-একবার। আবার উলটো দিকে, পশ্চিমের উদ্‌ভ্রান্ত রবীন্দ্রচর্চায় যদি বিরক্ত হন কেউ, তাহলে তিনিও ধিক্‌কার দিতে থাকেন কেবল প্রাচ্য দর্শনকে। অসহিষ্ণু লরেন্স-এর মতো কেউ একজন বলে উঠতে পারেন তখন, পূর্বজগৎ কেবল অতীতের দিকে আকর্ষণ করে আমাদের, ভাবীকালের জন্য এখানে আশা করবার কিছু নেই। এবং রবীন্দ্রনাথ, লরেন্স-এর ধারণায়, নিতান্তই সেই প্রাচীন প্রাচ্যের এক প্রতিনিধি।

একটা কূট প্রশ্ন অবশ্য উঠবে এখানে। কাকে বলা হবে এই প্রাচ্যতা অথবা ভারতীয়তা? ভারতীয় ঐতিহ্য বলতে ঠিক-ঠিক কী বোঝায়? আইসল্যাণ্ড-এর একটি খনির মধ্যে মৃদু আলোয় গীতা পড়ছেন এক শ্রমিক, এই দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন কর্নেল অলকট। এরই মধ্যে তিনি শুনেছিলেন ভারতীয়তার মহিমময় জয়ধ্বনি। গীতার সেই মহিমাই কি ভারতীয়তা? হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তিনটি শব্দে বুঝতে চেয়েছিলেন ভারতধর্মের সারাৎসার: সমঞ্জসতা, সহিষ্ণুতা, গ্রহিষ্ণুতা। আমাদের দেশের ইতিহাস কি সত্যিই সব সময়ে প্রমাণ করেছে এই লক্ষণগুলি? অথবা ভারতীয়তার বিশ্লেষণে উন্মুখ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় জানান যে অতীন্দ্রিয়ে বিশ্বাস, চরাচরে

ঐক্যের বোধ আর পরম সত্যকে জানবার আকাঙ্ক্ষাই হলো ভারতের ঐকান্তিক চরিত্র। কিন্তু এ কি কেবল এদেশেরই নিজস্ব ধরন? শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে যা-কিছু লেখা হয়েছে এদেশে—এর শাস্ত্র আর সাহিত্য—তার যোগফলটাই কি ভারতীয় ঐতিহ্য? না কি এর মধ্য দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ঐক্যময় অন্তঃশীল কোনো ভারতীয়তার বোধ? এমন কিছুই কি এদেশে লেখা হয়নি যা সেই বোধের অথবা তার আপাত-যোগফলের একেবারে বিপরীত কোনো ভূমি তৈরি করে তুলেছে? যদি তা হয়ে থাকে, তবে তাকেও কি আমরা ভারতীয় চেতনাই বলব না?

এইসব প্রশ্ন আছে বলেই রবীন্দ্রনাথের ভারতবোধ নূতনভাবে বিচার করে দেখবার যোগ্য। অনেকসময়ে তিনি জানিয়েছেন যে বিশ্বমুখী মিলনের সাধনাই ভারতাত্মার সাধনা, বিচিত্র বিভেদের মধ্যে মৈত্রীমন্ত্রই ভারতবর্ষের চরিত্র। কিন্তু সত্যি সত্যি তো শেষ পর্যন্ত তিনি বুঝেছিলেন যে তাঁর চিত্ত যে-মহাভারতের অধিবাসী, সে-মহাভারতের ভৌগোলিক অস্তিত্ব কোথাও নেই। সে হলো এক মনগড়া পরিণতিশীল ধারণা মাত্র, আধুনিক চেতনার রসায়নে যার সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের আলোচনা করতে গিয়ে এই সমস্যা নিয়েই একবার ভেবেছিলেন শোয়াইট্‌জার। সত্যের উপলব্ধি আমাদের পৌঁছে দেয় সৃষ্টির অন্তর্গত কোনো নিয়মের অস্তিত্বে, কিংবা সুন্দরের অনুভূতি আমাদের ধরিয়ে দেয় বিশ্বের নিহিত সংগতি—রবীন্দ্রনাথের এসব ভাবনাকে কেন বিশেষভাবেই 'ঔপনিষদিক' বলে গণ্য করা হবে, তা ভালো বুঝতে পারেননি শোয়াইট্‌জার। এসব তো কাউকে মনে করিয়ে দিতে পারে শ্যাফ্‌ট্‌স্‌বেরি অথবা ফিক্‌টের কথাও? অহং-এর বিকাশকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেন রবীন্দ্রনাথ,

তার সঙ্গে শোয়াইট্জার মিল দেখতে পান অনেক উনিশ শতকীয় ফরাসি দার্শনিকের। রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর নিজস্ব ভাবনাচিন্তাকে অনেকসময়েই প্রাচীন ভারতের উৎসজাত বলে চিহ্নিত করতে চান, সেইটেকেই রবীন্দ্রভাবনার সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা বলে বর্ণনা করে-ছিলেন শোয়াইট্জার।

আবার, অনেক সময়েই আমরা ধরে নিয়েছি যে আধ্যাত্মিকতার প্রবাহেই হলো ভারতীয়তার মৌলিক শক্তি। পশ্চিম বস্তুবাদী, আর আমরা আত্মিক: এই সহজ হিসেবটা আমরা অনেকদিন ধরেই আত্মস্থ করে নিয়েছি। কিন্তু এই হিসেবের কাজে অনেকসময়েই কি আমরা ইচ্ছেমতো নির্বাচন করে নিই না? ইচ্ছে-মতো ব্যাখ্যা? ঈষৎ হালকা চালে আধুনিক একজন লেখক, সতীনাথ ভাদুড়ী, এই প্রশ্ন তুলেছিলেন একবার, বৈদিক ব্রহ্মবাদিনীরা সত্যিই কি 'আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম শিখরে' উঠেছিলেন। লক্ষ করলে তো দেখা যাবে যে, সেই নারীদল, লোপামুদ্রা বা লোমশা, শাশ্বতী অথবা অপালা, বিশ্ববারা অথবা ঘোষা: এঁরা সবাই বলছেন কেবল সঙ্গসুখের কথা, ঐহিকতায় শারীরিকতায় ভরপুর। এইটেই নিশ্চয় বৈদিক প্রার্থনার একমাত্র কথা নয়, কিন্তু এদিকটাকে বর্জনই বা করা যাবে কীভাবে? কীভাবেই-বা বলা যাবে যে প্রতিপত্তিশীল আর্য শাস্ত্রগুলির মধ্যেই নিহিত আছে ভারতীয়তার যাবতীয় উপকরণ, কেনই-বা গণ্য করা হবে না এর লোকায়ত আচরণগুচ্ছ?

২

আধুনিক কোনো লেখকের ভাবনায় ভারতীয়তার চিহ্ন কতটুকু, এর বিচার করতে গেলে এসব সমস্যাকে আজ আর উপেক্ষা করা

সম্ভব নয়। কোনো বইয়ের নাম যদি হয় 'রবীন্দ্র-সংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস' তবে প্রথমে মনে হতে পারে যে এখানে আমরা তেমন কোনো বিচারই পাব, পাব ভারতীয়তা বিষয়ে নূতন কোনো বোধের পরিচয় আর বিশ্লেষণ। কিন্তু শ্রীমতী পম্পা মজুমদার তাঁর ওই-নামের গবেষণা-বইটিতে এসব প্রশ্নের মীমাংসার কোনো চেষ্টা করেননি। এর ভূমিকাতে প্রথমেই আমরা জেনে নিয়েছি যে তাত্ত্বিকতার উপর তাঁর ভর নয়, তিনি চেয়েছেন কেবল 'তাথ্যিকতা'। সূচনায় এই লেখিকা যদিও একবার আমাদের আশ্বাস দেন যে ভারত-আত্মার স্বরূপ বিষয়ে 'যথাস্থানে' তিনি আলোচনা করবেন, কিন্তু সে-আলোচনায় জটিল কোনো জিজ্ঞাসা ওঠে না, মেনেই নেওয়া হয় অনেকদিনের পুরোনো কয়েকটি তর্ক-সাপেক্ষ সিদ্ধান্ত। রবীন্দ্রনাথের সূত্র দিয়েই রবীন্দ্রনাথকে দেখতে চান তিনি ; সংক্ষেপে তাই তিনি বলতে পারেন যে 'মানবচৈতন্যের মধ্যে বিশ্বাভিমুখী মিলনের সাধনাই ভারত-আত্মার সাধনা এবং এই অভিপ্রায়সিদ্ধির মৌল পন্থা প্রীতি বা মৈত্রীভাবের বিস্তার' অথবা বলেন যে ভারত-সংস্কৃতির মূল কথা হলো 'বিচিত্র বিরোধবিভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করবার অভিপ্রায়'। পাঠকমাত্রেই বুঝতে পারবেন যে এসব সূত্রনির্দেশের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের অতিপরিচিত স্বরটিই আরেকবার আমরা শুনতে পাই।

বারেবারেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের জানিয়েছেন যে, তাঁর বোধ, তাঁর ধর্ম কোনো শাস্ত্র থেকে পাওয়া নয়, তা গড়ে উঠেছে কেবল তাঁর জীবনযাপনেরই অভিজ্ঞতা থেকে। কিন্তু তবু সেই বোধের সঙ্গে—খানিকটা অকারণেই হয়তো—শাস্ত্রকে মিলিয়ে দেখতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ নিজেও। তাই তাঁর রচনা ভরে ওঠে পুরোনো

ভারতীয় রচনাবলী থেকে উল্লেখপুঞ্জে। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য চৈতন্যদেবকে দেখাতে হয়েছিল মালাধর বসুরও নজির, রবীন্দ্রনাথও তাঁর আধুনিক মানবধর্মকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্যে তুলে এনেছিলেন গোটা ভারতীয় ভুবন। তার দ্বারা তিনি কতটা প্রভাবিত, সে-কথার চেয়ে জরুরি হলো এই যে তাকে তিনি ব্যবহার করেছেন কতটা।

এই ব্যবহারের ব্যাপ্তি বিষয়ে আমাদের যে কোনোই ধারণা ছিল না, এমন নয়। কিন্তু এই ধারণার তেমন উপযুক্ত তথ্যভিত্তি আমাদের সামনে ততটাই তৈরি ছিল না এতদিন, এও সত্যি। আর, হাতের সামনে যোগ্য উপকরণ সাজানো না থাকলে বড়ো বড়ো পণ্ডিতজনেরাও কেমন অসতর্ক মন্তব্য করে বসেন, অনেক সময়ে তা আমরা টের পাই। উপনিষদ আর রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক নিয়ে এক বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন একদিন শশিভূষণ দাশগুপ্ত। তাঁর সেই অন্যথাসক্ষম আলোচনা শশিভূষণ শুরু করেছিলেন বিশেষ-একটি শ্লোকের ব্যাখ্যায়, রবীন্দ্রবিচারে সেইটেকেই তাঁর মনে হয়েছিল সবচেয়ে বড়ো চাবিকাঠি। কেননা ঈশোপনিষদের সেই বাণী, শশিভূষণের ভাষায়, 'রবীন্দ্রনাথকে সারাজীবন একেবারে যেন ভূতে পাওয়ার মতো পাইয়া বসিয়াছিল।' সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের কৌতূহল জেগে ওঠে: কোন্ সেই বাণী? নিশ্চয়ই 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্'? ঈশোপনিষদের প্রসিদ্ধ সেই আদি শ্লোকটিই নিশ্চয়? কিন্তু না, লেখকের পরবর্তী বাক্যেই আমাদের সে-ধারণা সাময়িকভাবে টলে যায়, তিনি বলেন একেবারেই ভিন্ন একটি শ্লোকের কথা: হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। সন্দেহ নেই যে এই হিরণ্ময় পাত্রটিও বেশ কয়েকবার ঘুরে এসেছিল

তাঁর লেখায়, কিন্তু এইটিকেই কি বলা যাবে একেবারে 'ভূতে পাওয়ার মতো' টান? তেমনই কি বেশি ছিল এর প্রয়োগ? 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্'ও কি এর চেয়ে অনেক বেশি বলেননি রবীন্দ্রনাথ, কিংবা 'অসতো মা সদ্গময়'?

এ প্রশ্নের কী উত্তর হবে? এতদিন আমরা ভাবতে পারতাম যে হাতের সামনে যোগ্য উপকরণ সাজানো নেই, সম্ভব নয় এ নিয়ে নির্দিষ্ট কিছু বলা। মন যদি কারো উশকেও ওঠে, কে এখন সমগ্র রবীন্দ্ররচনা সন্ধান করে দেখবে কোন্ শ্লোকের কতটা প্রয়োগ ঘটেছে তাঁর লেখায়। কিন্তু যদি কেউ তা দেখতেন, যদি কেউ সাজিয়ে ধরতেন এই উপকরণ-কোষ, তাহলে পাঠকদের সঙ্গে সঙ্গে গবেষক-দেরও সাহায্য হতো অনেকটা। তাহলে হয়তো সহজেই জানা যেত যে 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্' রবীন্দ্রনাথের কাজে লেগেছিল অন্তত উন-পঞ্চাশবার, বত্রিশবার তিনি ব্যবহার করেছেন 'অসতো মা সদ্গময়', উনিশবার 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্', আর 'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ' প্রত্যক্ষে পরোক্ষে তাঁর লেখায় দেখা দিচ্ছে এগারোবার মাত্র। বস্তুত, শেষ এই শ্লোকটির চেয়ে অনেক বেশিবার ঘুরে ঘুরে এসেছে, রবীন্দ্ররচনায় এমন ঔপনিষদিক বাণীর সংখ্যা নিতান্ত একটি-দুটি নয়। আর, এই হিসেব যে কেবল সংখ্যাতত্ত্বের কৌতূহলই মেটায় তা নয়, এই পক্ষ-পাতের ধরন থেকে রবীন্দ্রনাথের মনের কয়েকটি অভিপ্রায় বুঝে নেওয়াও হয়তো সহজ হয়।

শ্রীমতী পম্পা মজুমদারের বইটি ছাপা হবার পর এখন বলা যাবে যে আমাদের হাতের কাছে তৈরি রইল যোগ্য একটি উপাদান-ভাণ্ডার। উপরের অনুচ্ছেদে যে গাণিতিক হিসেবটা অনায়াসে সম্ভব হলো, সে কেবল নূতন এই বইটির সৌজন্যে। কেবল উপনিষদ নয়,

সমগ্র প্রাচীন এবং মধ্যযুগের ভারতবর্ষকে কীভাবে রবীন্দ্রনাথ ধরে আছেন তাঁর ভাবনায়, এ বইটি সন্ধান করছে সেই বৃত্তান্ত। 'ভারতীয় ঐতিহ্যের ভাবধারা রবীন্দ্রমানসকে কতদূর অধিকার করেছিল এবং তিনি কীভাবে তাকে গ্রহণ করে আপন রচনায় ব্যবহার করেছিলেন' এ বই দেখাচ্ছে সেইটে। ধৈর্য ও শ্রমের এক বিরল দৃষ্টান্ত, সাড়ে সাতশো পৃষ্ঠার এ বইটিকে এখন থেকে আমাদের প্রাত্যহিক অভি-ধানের মতো ব্যবহার করতে হবে রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে।

৩

দুটি খণ্ডে সাজানো এ বই। প্রথম খণ্ড আলোচনানির্ভর, আর দ্বিতীয় খণ্ড কেবলই উপাদান-সংকলন। প্রাচীন শাস্ত্র আর সাহিত্যকে কীভাবে দেখছেন রবীন্দ্রনাথ, কীভাবে এসেছেন তার সাহচর্যে অথবা কীভাবে বিচার করছেন তার—সেই ঐতিহাসিক বিবরণ নিয়েই প্রথম খণ্ড। প্রায় আড়াইশো পৃষ্ঠাব্যাপী দ্বিতীয় খণ্ডে আছে কেবল সেই শাস্ত্র বা সাহিত্য থেকে ব্যবহৃত উদ্ধৃতি বা উল্লেখের পূর্ণ তালিকা। এটা বললে অন্যায় হয় না যে এই দ্বিতীয় খণ্ডটুকু স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থের মর্যাদা পেয়ে যায়। যে অভিনিবেশ আর দক্ষতায় এই উপাদান সংগ্রহ করেছেন লেখিকা, কোনো-কোনো শব্দগুচ্ছ বা শব্দেরও উৎস সন্ধান করেছেন যেভাবে, আমাদের এই ফলোৎসুক কর্মহীনতার দেশে তার তুলনা মিলবে অল্পই। কেবল রবীন্দ্ররচনার আনুপূর্বিক পাঠ নয়, এ কাজের জন্য লেখিকার দরকার হয়েছিল প্রায় সমস্ত প্রাচীন সাহিত্য পাঠের; আর এ বইয়ের যে-কোনো পৃষ্ঠা খুললে বোঝা যাবে যে সে-দায়িত্ব কেমন নিরলস আগ্রহে তিনি উদ্‌যাপন করেছেন। তাঁকে দেখতে হয়েছে বেদ বা উপনিষদ,

রামায়ণ বা মহাভারত, দেখতে হয়েছে কালিদাস ভবভূতি ভর্তৃহরি বাণভট্ট, গীতা বা মনুসংহিতা, অথবা ধম্মপদ। এটা ঠিক যে উল্লিখিত এই নামপুঞ্জের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আজন্ম পরিচয় অনেকেই অনুমান করতে পারবেন, একজন গবেষকের পক্ষে এসব অঞ্চল পরিক্রমা করে আসবার ইচ্ছেটা তাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ বই হাতে না পেলে আমাদের সন্দেহ হতো না যে রবীন্দ্রনাথ শ্লোক প্রয়োগ করেন যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ থেকেও, অথবা তাঁর কাজে লাগে দক্ষসংহিতা বা আপস্তম্ব-সংহিতারও শ্লোক, ঘটকর্পরের 'নীতিসার' থেকেও তিনি লাইন তুলে আনেন অন্তত বারোবার।* অল্পদিন আগেও নীহাররঞ্জন রায় আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে রবীন্দ্রসাহিত্যে ছ-বারের বেশি নেই গীতা-প্রসঙ্গ, আর এই তথ্যের নজিরে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁর মননের ভিন্নতা। আজ তিনি নিশ্চয় চমকে যাবেন এ বইয়ের আটপৃষ্ঠাব্যাপী তালিকা দেখে, যে তালিকা থেকে আমরা জানতে পাই যে প্রায় নব্বইবার রবীন্দ্রনাথ হাতে তুলে নিয়েছিলেন গীতার শ্লোক। আর এই সমস্ত তথ্য যেভাবে কালক্রমে সাজিয়েছেন লেখিকা—উৎসের কাল এবং ব্যবহারের কাল—যেভাবে দেখিয়েছেন কোথায় আছে উৎস থেকে পূর্ণ উদ্ধৃতি, কোথায় আংশিক, আর কোথায়-বা প্রত্যক্ষ উল্লেখ বা অনুবাদ মাত্র, তা দেখে আমাদের অভিভূত লাগে।

* লেখিকার প্রস্তুত তালিকাটি মান্য করেই এই সংখ্যাটি বলছি। কিন্তু, অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে, এ তালিকার বাইরে হঠাৎ আমার মনে পড়ছে 'হাস্যকৌতুক'-এর একটি হালকা ব্যবহার 'চলচ্চিত্তং চলদ্‌বিত্তং চলজ্জীবন-যৌবনম্'। এই হয়তো রবীন্দ্ররচনায় ঘটকর্পরের প্রথম আবির্ভাব। এর সময় হলো ১২৯৩ সাল।

আলোচনার দিক থেকে এ বইয়ের একটি জরুরি অধ্যায় হলো 'হেবর্‌লিনের কাব্যসংগ্রহ'। ছোটোবেলা থেকে দেবেন্দ্রনাথ অথবা সত্যেন্দ্রনাথের সাহচর্যে প্রাচীন ভারতের সাহিত্যজগতে অধিকার জন্মাচ্ছিল রবীন্দ্রনাথের, সে কথা ঠিক। এও আমরা জানি, কীভাবে উত্তরজীবনে ক্ষিতিমোহন সেন অথবা বিধুশেখর শাস্ত্রীর সান্নিধ্য তাঁর নিবিড় উপকারে এসেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন অনুমান করবার কারণ আছে যে শাস্ত্র সাহিত্যের সমস্ত উল্লেখই তাঁর মূল বই পড়ার অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া নয়, এর খানিকটা হয়তো তিনি পেয়েছিলেন অন্যের ব্যবহার থেকে কিংবা 'নবরত্নমালা'র মতো কোনো সংকলন-বই থেকে। এই সম্ভাবনার কথা মনে রেখেই লেখিকা এখানে বিশ্লেষণ করছেন শ্রী ডাক্তার যোহন হেবর্‌লিন কর্তৃক সমাহৃত 'কাব্যসংগ্রহঃ' বইটির, যে-বইয়ের খুব সংক্ষিপ্ত একটি চকিত উল্লেখ আছে 'জীবনস্মৃতি'তে। লেখিকা দেখতে পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের পড়া সেই বিশেষ বইখানিই, তার পাতায় নানা লেখা বা চিহ্ন। এই চিহ্ন বা লেখনগুলির মধ্যে কোন্‌গুলি রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত হওয়া সম্ভব, সযত্নে তার বিশ্বাসযোগ্য বিচার করেন লেখিকা। যোগ্যভাবেই তিনি দেখান যে অনেক শ্লোক রবীন্দ্রনাথ তুলে নিয়েছেন এই সংকলন থেকেই, কেননা এখানে ধৃত বিশেষ পাঠটিই অনেকসময়ে পাওয়া যাবে তাঁর লেখায়। আর, হয়তো, এই সংকলনেরই প্রভাবে, ঋতুসংহার থেকে 'সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ' শব্দগুচ্ছ প্রায়ই আমরা শুনতে পাই তাঁর লেখায়, হেবর্‌লিনের সংগ্রহ ছাড়া আর সর্বত্রই যে-শ্লোকের পাঠ হলো 'সমাগতোরাজব-দুদ্ধতদ্যুতিঃ'।

৪

রবীন্দ্রনাথের মতামতের মূল্যায়ন লেখিকার উদ্দেশ্য নয়, ব্যক্তিগত মন্তব্যও তিনি এড়িয়ে চলতে চান, এ বইয়ের ভূমিকায় একথা বলা আছে। বইটিকে তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছেন একেবারেই আত্ম-নিরপেক্ষ এক তন্ময় বিবরণ হিসেবে। কিন্তু, তাঁর প্রায় ত্রুটিহীন এই আদরণীয় কাজের মধ্যে এমন দুটি-একটি সামান্য সিদ্ধান্ত হঠাৎ চোখে পড়ে, এখানে যা মানায় না। উপনিষদ বৌদ্ধসাহিত্য গীতা বা কালিদাসের মতো বড়ো বড়ো জগৎ পেরিয়ে এসে যখন ভর্তৃহরি অধ্যায়ে লেখিকা বলে বসেন 'এই দিক থেকে দেখতে গেলে রবীন্দ্র-নাথকে বলতে হয় তিনি ভারতীয় কবি ভর্তৃহরির যোগ্য উত্তরসূরী,' তখন এই অতিসরলীকরণে একেবারে বিমূঢ় হয়ে পড়ি আমরা। ভর্তৃহরি? ভোগ এবং বৈরাগ্যের সমন্বয় বিষয়ে তাঁর জীবনকথা নিয়ে কিছু কিংবদন্তির প্রচলন আছে, আর সেই কিংবদন্তিকে দু-একবার রবীন্দ্রনাথ মনেও করেছেন শ্রদ্ধাভরে, তা ঠিক। কিন্তু 'বৈরাগ্যমেবাভয়ম্'-কে কি তিনি প্রত্যাহারই করেননি? যে-কবি বলতেন 'ভাগ্যানি পূর্বতপসা খলু সঞ্চিতানি। কালে ফলন্তি পুরুষস্য যথৈব বৃক্ষাঃ' অথবা 'জীবে বারিতরঙ্গচঞ্চলতটে সৌখ্যম্ কুতঃ প্রাণিনাম্', তিনি কি হতে পারেন রবীন্দ্রনাথের পূর্বসূরী? এ শ্লোকগুলি অবশ্য ব্যবহার করতে হয়নি লেখিকাকে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে যেখানে তিনি ভর্তৃহরির কথা বলছেন, সেখানেও লক্ষ করা উচিত যে 'বৈরাগ্যমেবাভয়ম্' (তিন বার) আর 'ততঃ কিম্' (সাত বার) শব্দগুচ্ছকে রবীন্দ্রনাথ নিতান্ত শব্দ হিসেবেই ব্যবহার করেন, তার তাৎক্ষণিক অর্থে, ভর্তৃহরির মূল শ্লোকের সঙ্গে তার সম্পর্ক-

সমর্থন তেমন কিছু নেই। আর, এ-দুটি শব্দগুচ্ছের বাইরে ভর্তৃহরি-কে কবি মনে করেছেন আর চার-পাঁচবার মাত্র।

এ হলো ঠিক সেইরকমের ভুল যার থেকে শোয়াইট্জার সতর্ক করতে চেয়েছিলেন আমাদের। যে-কোনো উল্লেখ বা যে-কোনো সাদৃশ্যেই প্রভাব বা উত্তরসাধনা দেখতে পাওয়া এক বিপজ্জনক অভ্যাস। এটা ভালো যে এই বিপদ এ বইতে অনেকবার ঘটেনি। সেদিক থেকে, এই সংকলনের ব্যাপ্তি আর শুদ্ধির দিকে চোখ রেখে বলা যায় যে রবীন্দ্রচর্চার জগতে এটি চমৎকার এক নির্ভরযোগ্য আবির্ভাব। প্রবোধচন্দ্র সেন নিতান্ত মিথ্যা লেখেননি যে, এখন থেকে অনেকদিন পর্যন্ত এ বই ভাবী গবেষকদের পথনির্দেশ করবে রবীন্দ্রগবেষণার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকরগ্রন্থ হিসেবে।

—